শেখার সেতু

পঞ্চম শ্রেণি

গণিত

আমাদের পরিবেশ

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন । পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । বিশেষজ্ঞ কমিটি ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শেখার সেতু

গণিত

আমাদের পরিবেশ

পঞ্চম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন

বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১ বিধাননগর, সেক্টর-২
কলকাতা-৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

প্রাথমিক স্তরের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে অতিমারির আবহে প্রায় সমস্ত বিষয়ে ব্রিজ মেটিরিয়াল 'পঠন সেতু' অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রকাশ করা হলো। অতিমারির কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিন ছেদ করার কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি আশা করা যায় সেই ঘাটতি পূরণে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে ব্যবহার করবেন। এই 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই আশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডিসেম্বর, ২০২১
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি কে - ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনায় ও বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে করোনা আতিমারির আবহেও রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল বিষয়ের 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে শিখন-ঘাটতি স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে সেই অভাব পূরণ করতে এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই আশা করা যায়। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই 'ব্রিজ মেটিরেয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শেখার সেতু

গণিত

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদন ও বিন্যাস

মলয় কৃষ্ণ মজুমদার

অশোক তরু মণ্ডল খোকন দাস

বিষয় নির্মাণ

মনীশ দাস দীপক রায় উৎপল মুখোপাধ্যায়

মলি পাল ঘোষ দেবাশিস মুখার্জী সুজয় শিকদার

Supported by

Sr. Gloria Mary A.C Punam Pradhan Pinky Pari Thapa

Chedup Singar (Tamang) Manohar Chamling Rai Sandhya Yonzon

Tshering Yolmo Nikita Gurung

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা পরিচিতি	১-৩
২.	পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ	৪-৫
৩.	পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার গুণ	৬-৭
৪.	পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার ভাগ	৮-৯
৫.	গুণনীয়ক	১০-১১
৬.	গুণিতক	১২-১৩
৭.	প্রকৃত ভগ্নাংশ	১৪-১৭
৮.	অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশ	১৮-২০
৯.	পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল	২১-২৪
১০.	সরলের নিয়ম	২৫
১১.	দশমিক ভগ্নাংশ	২৬-২৮
১২.	বিন্দু, রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি	২৯-৩০
১৩.	কোণের পরিমাপ	৩১
১৪.	চিত্রলেখ	৩২
১৫.	ঘনবস্তু	৩৩-৩৪
১৬.	ঐকিক নিয়ম	৩৫-৩৬
১৭.	ত্রিভুজ	৩৭-৩৮
১৮.	বৃত্ত	৩৯-৪০

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা পরিচিতি

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- পাঁচ অঙ্কের ও ছয় অঙ্কের দল গঠন করতে পারবে।
- পাঁচ অঙ্কের ও ছয় অঙ্কের সংখ্যাগুলির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
- স্থানীয় মান ও প্রকৃত মান অনুযায়ী বিস্তার করতে পারবে।
- পাঁচ অঙ্কের ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম সংখ্যা লিখতে পারবে।

টাকার হিসাব করি :

ফাঁকা ঘর পূরণ করি :

		শতক	দশক	একক
	এক			১
	নয়			৯
10 দশটি এর বদলে একটি	দশ		১	০
দশটি এর বদলে একটি	একশ	১	০	০
	পাঁচশ তেতাল্লিশ			
	নয়শ নিরানব্বই			

রঙিন কার্ড সাজিয়ে সংখ্যা বানাই

	হাজার	শতক	দশক	একক
১০০ ১০০ ১০ ১০ ১		২	২	১
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১				
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১				

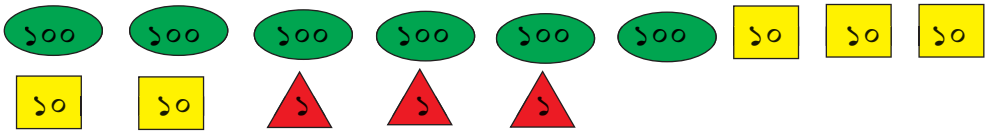

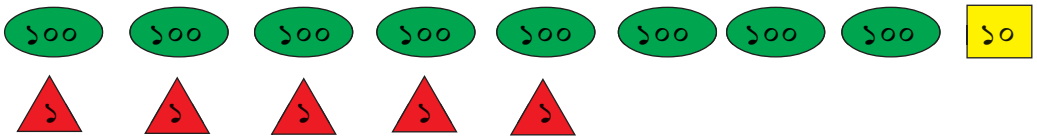

	হাজার	শতক	দশক	একক
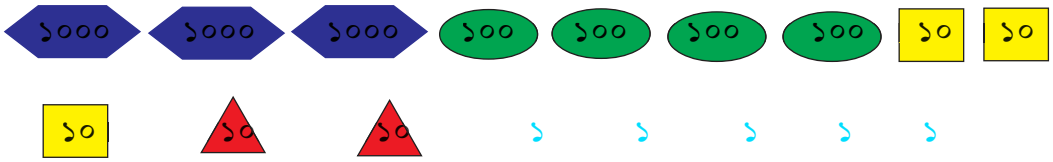	৩	৪	৩	২
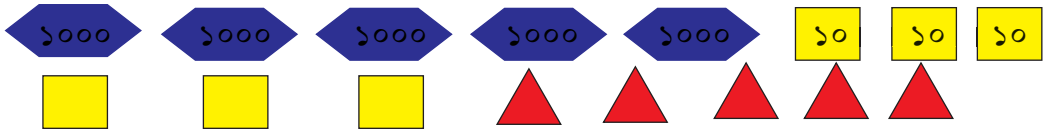				
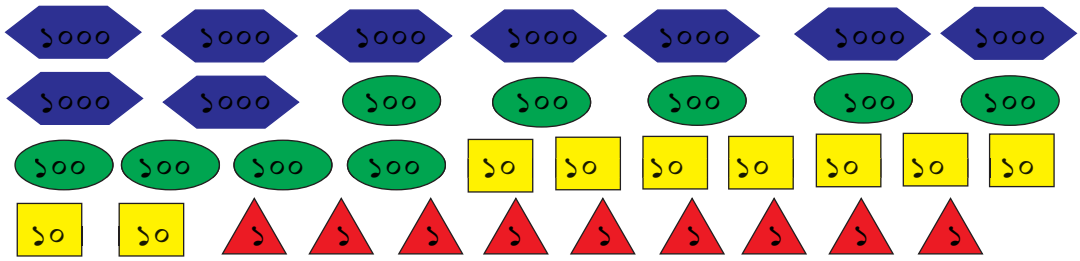	৯	৯	৯	৯

শতকের পরের ঘরটির নাম হাজার

১০ টি এর বদলে ১টি নেব। হাজারের পরের ঘরটির নাম অযুত।

১ অযুত = ১০ হাজার।

	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক
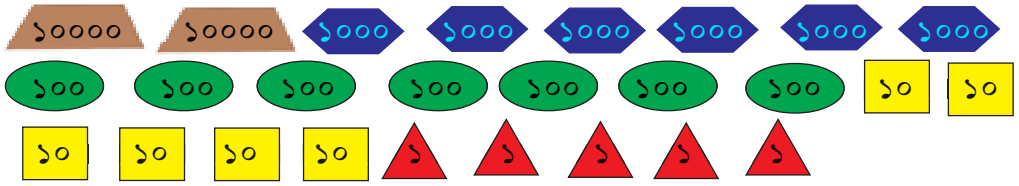	২	৬	৭	৬	৫
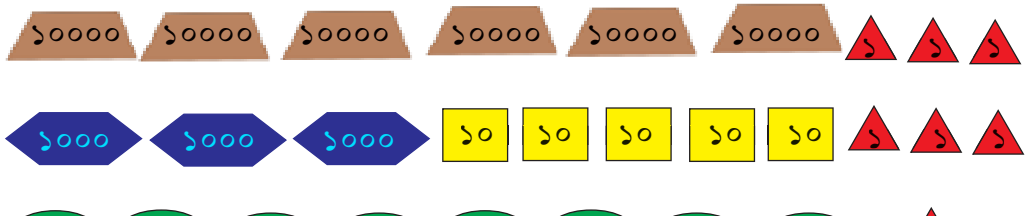					
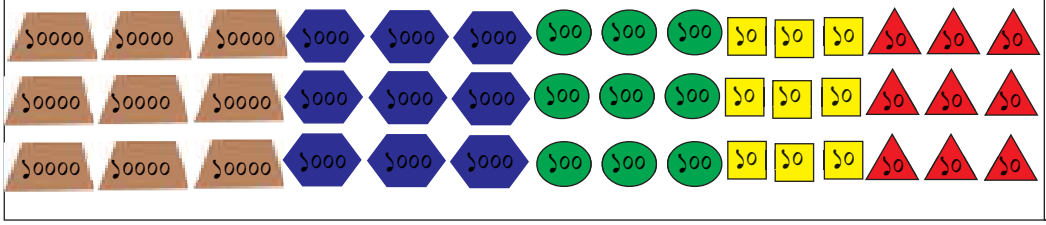					

১০ টি অযুতে হয় ১০০০০ × ১০ = ১০০০০০ অর্থাৎ এক লক্ষ। অযুতের পরের ঘরটির নাম লক্ষ।

ছক পূরণ করি

লক্ষ	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক	বিস্তার করে লিখি	কথায় লিখি
২	১	৫	৭	২	৪	২০০০০০ + ১০০০০ + ৫০০০ + ৭০০ + ২০ + ৪	দুই লক্ষ পনের হাজার সাতশ চব্বিশ
						৫০০০০০ + ২০০০০ + ৯০০০ + ১০০ + ৮০ + ৭	পাঁচ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশ সাতাশি
১	৮	২	৩	৬	৫		
						৯০০০০০ + ৯০০০ + ৯০০০ + ৯০০ + ৯০ + ৯	

জেনে রাখি

লক্ষ	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক	
					১	→ এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
				১	০	→ দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
			১	০	০	→ তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
		১	০	০	০	→ চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
	১	০	০	০	০	→ পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা
১	০	০	০	০	০	→ ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা

লক্ষ	অযুত	হাজার	শতক	দশক	একক	
					৯	→ এক অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা
				৯	৯	→ দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা
			৯	৯	৯	→ তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা
		৯	৯	৯	৯	→ চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা
	৯	৯	৯	৯	৯	→ পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা
৯	৯	৯	৯	৯	৯	→ ছয় অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা

যোগ করি

৯ + ১ = ১০ অর্থাৎ ১ দশক ০ একক

	ল	আ	হা	শ	দ	এ
	◯	◯	◯	◯	①	
পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা→		৯	৯	৯	৯	৯
					+	১
	☐	☐	☐	☐	☐	০

যোগফল ☐ , এটি ☐ অঙ্কের ☐ সংখ্যা।

বিয়োগ করি

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
		⑨	⑨	⑨	⑨	১০
ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা→	১	০	০	০	০	০
					–	১
		☐	☐	☐	☐	☐

বিয়োগফল ☐ , এটি ☐ অঙ্কের ☐ সংখ্যা ।

পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- পাঁচ / ছয় অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে দুই / তিন / চার অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে।
- যোগ বা বিয়োগ হবে এমন বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

বুঝে নিয়ে যোগ করি

১ + ৮ + ২ = ১১ দশক
= ১ শতক ১ দশক তাই
শতকের মাথায় (১) বসাই।

৭ + ৫ = ১২
= ১ দশক ২ একক তাই
দশকের মাথায় (১) বসাই।

	অ	হা	শ	দ	এ
			(১)	(১)	
	২	৩	০	৮	৭
+				২	৫
	২	৩	১	১	২

	অ	হা	শ	দ	এ
			(২)	(১)	
	৫	৬	২	৯	৪
			৩	৭	১
+				৪	৮
	☐	☐	☐	☐	৩

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
				(১)	(১)	
	৪	২	৮	৫	৮	৩
+				৩	৪	৯
	☐	☐	☐	☐	৩	২

	অ	হা	শ	দ	এ
		◯	◯	◯	
	৩	২	৭	৫	৩
		৪	১	৮	০
			৫	১	২
+				৯	৮
	☐	☐	☐	☐	☐

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
	◯	◯	◯		◯	
	১	৯	২	৩	২	৭
		৬	৪	৮	২	৩
+			৭	৪	৩	৯
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- আমাদের পাড়ার পাঠাগার উদ্বোধন হবে। আলমারি কিনতে ৪২৩৭০ টাকা, বই কিনতে ৩০২৪৫ টাকা, বিল-কার্ড ছাপাতে ১০০০ টাকা এবং ফুল-মিষ্টিতে ৫৪৮ টাকা খরচ হয়েছে। মোট কত খরচ হয়েছে হিসেব করে দেখি।

আলমারি কিনতে — ৪ ২ ৩ ৭ ০ টাকা
বই কিনতে — ☐ টাকা
বিল-কার্ড কিনতে — ☐ টাকা
ফুল মিষ্টি কিনতে — ☐ টাকা

মোট খরচ — ☐ টাকা

বুঝে নিয়ে বিয়োগ করি—

	অ	হা	শ	দ	এ
				৭	১০ + ২
	৪	৭	১	~~৮~~	~~২~~
−				৬	৫
	৪	৭	১	১	৭

২ টি এক থেকে ৫ টি এক সরানো যায় না। তাই ১ দশক ধার নিয়ে ১০ + ২ = ১২ এককের মাথায় লিখি।

	অ	হা	শ	দ	এ
		□	১০ + □	□ + ২	১০ + □
	১	~~৬~~	~~২~~	~~৩~~	৫
−			৩	৪	৭
	□	□	□	□	□

	অ	হা	শ	দ	এ
	৪	□ + ১	□ + ৩	৬	□ + □
	~~৫~~	~~২~~	~~৩~~	~~৭~~	৪
−		৩	৪	২	৫
	□	□	□	□	□

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
			৮	১০ + ২	১০ + ০	১০ + ৫
	৩	১	~~৯~~	~~৩~~	~~১~~	~~৫~~
−				৮	৪	৭
	□	□	□	□	□	□

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
	৫	□ + □	□ + □	□ + ১	১০ + □	
	~~৬~~	~~৫~~	~~৪~~	~~২~~	~~৫~~	৭
−		৮	৯	৭	৮	৫
	□	□	□	□	□	□

- বাবার ব্যাঙ্কে ৯৮০৬৭৫ টাকা জমা ছিলো। দিদির বিয়েতে তা থেকে খরচ হওয়ার পর এখন ব্যাঙ্কে ৫২৭৩৪৮ টাকা পড়ে আছে। দিদির বিয়েতে কত টাকা খরচ হয়েছে হিসেব করি।

	ল	অ	হা	শ	দ	এ	
		□	□ + □		□	□ + □	
বাবার ব্যাঙ্কে ছিলো —	৯	~~৮~~	০	৬	~~৭~~	~~৫~~	টাকা
এখন ব্যাঙ্কে আছে —	৫	২	৭	৩	৪	৮	টাকা
দিদির বিয়েতে খরচ হয়েছে —	□	□	□	□	□	□	টাকা

পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার গুণ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- পাঁচ / ছয় অঙ্কের সংখ্যাকে এক/দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারবে।

বাগানের গাছ থেকে ফল পাড়ি

আজ রহিমবাবুর বাগানে ডাব আর আম পাড়া হচ্ছে। রহিমবাবু বলে দিয়েছেন প্রতিটি গাছ থেকে ২০টি করে ডাব পাড়তে। এখন ডাব গাছ আছে ১৫টি। কয়টি ডাব পাড়া হয়েছে হিসেব করি—

২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০

+ ২০ + ২০ + ২০ + ২০ + ২০ = ২০ × ১৫

↓ ↓

গুণ্য গুণক

বার বার যোগের বদলে ছোট করে গুণ করি

শ	দ	এ
	২	০
×	১	৫
৩	০	০

এখানে গুণ্য ২০ যার এককের ঘরে '০' আছে।

'০' দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হয়।

গুণফলে এককের ঘরে শূন্য বসিয়ে ২ দশক দিয়ে ১৫ গুণ করি। ১৫ × ২ = ৩০

রহিমবাবু বলে দিয়েছেন প্রতিটি গাছ থেকে ৩০টি করে আম পাড়তে। বাগানে আম গাছ আছে ২০ টি। কয়টি আম পাড়া হয়েছে হিসেব করি—

আম পাড়া হয়েছে = ☐ × ☐

শ	দ	এ
	৩	০
×	২	০
৬	০	০

এখানে গুণ্য ৩০ ও গুণক ২০ উভয়ের এককের ঘরে '০' আছে।

গুণফলে একক ও দশকের ঘরে শূন্য বসিয়ে, ৩ × ২ = ৬ বাদিকে বসাই।

নামতার সাহায্যে সরাসরি গুণ করি

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
গুণ্য—		৪	১	৫	২	৭
গুণক —					×	৫
গুণফল —	☐	☐	৭	৬	৩	৫

	ল	অ	হা	শ	দ	এ
গুণ্য—	১	৩	৬	৭	৮	৩
গুণক —					×	৭
গুণফল —	☐	☐	☐	☐	☐	☐

গুণককে বিশ্লেষণ করে গুণ করি :

ল	অ	হা	শ	দ	এ	
গুণ্য—			৭	৩	৯	৪	
গুণক —				×	১	৫	→ [১০] + [৫]
		৩	৬	৯	৭	০	← ৭৩৯৪ × ৫
	+	৭	৩	৯	৪	০	← ৭৩৯৪ × ১০
গুণফল —	□	□	□	□	□	□	

ল	অ	হা	শ	দ	এ	
গুণ্য—		২	০	৫	৪	৩	
গুণক —				×	২	৬	→ [২০] + [৬]
	১	২	৩	২	৫	৮	← ২০৫৪৩ × ৬
+	□	□	□	□	□	□	← ২০৫৪৩ × ২০
গুণফল —	□	□	□	□	□	□	

ল	অ	হা	শ	দ	এ	
গুণ্য—			২	৪	৫	৩	
গুণক —				×	৩	৪	২	→ [৩০০] + [৪০] + [২]
			৪	৯	০	৬	← ২৪৫৩ × ২
+		□	□	□	□	০	← ২৪৫৩ × ৪০
+	□	□	□	□	০	০	← ২৪৫৩ × ৩০০
গুণফল —							

পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার ভাগ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যাকে এক/দুই/অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবে।
- ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ এর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

১১৪ টাকা ৫ জন বন্ধু ভাগ করে নিই

১০০ টাকার নোট ৫ জনের মধ্যে ভাগ করা যায় না। তাই ১০ টাকার নোটে ভাঙিয়ে নিই।

ভাগ করে এক এক জন পেলাম ২টি ১০-এর নোট ও ২টি ১-এর কয়েন। প্রত্যেকে পেলাম ২ × ১০ টাকা = ২০ টাকা এবং ২ × ১ টাকা = ২ টাকা অর্থাৎ (২০ + ২) টাকা = ২২ টাকা। ৪টি ১ টাকার কয়েন পড়ে থাকল।

```
          ২   ২
      ┌──────────
      │ শ   দ   এ
   ৫  │ ১   ১   ৪
      │–১   ০   ↓
      └──────────
          ১   ৪
        – ১   ০
      ──────────
              ৪
```

১০ টাকার নোটে ভাঙিয়েছি তাই দশকের মাথায় ২ লিখি।

সরাসরি ভাগ করি :

৪৫৩৭ ÷ ৮

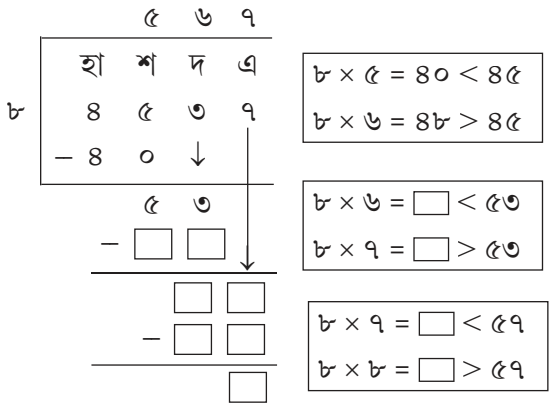

ভাজ্য = ৪৫৩৭, ভাজক = ৮

ভাগফল = □ , ভাগশেষ = □

২০৭৩৫ ÷ ৭

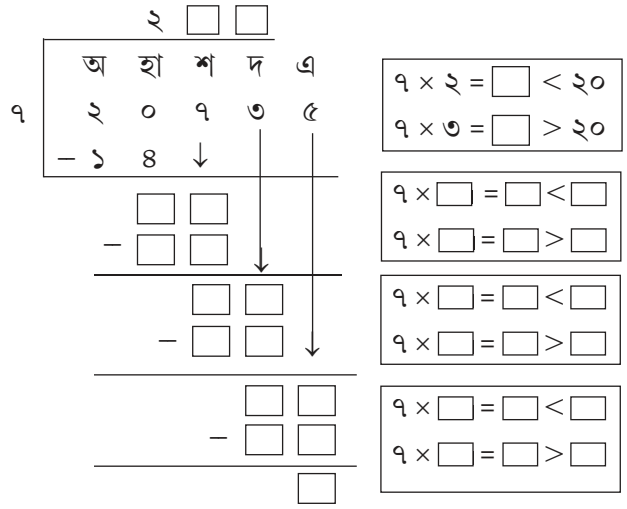

ভাজ্য = □ , ভাজক = □

ভাগফল = □ , ভাগশেষ = □

৬১৩৭২ ÷ ১৪

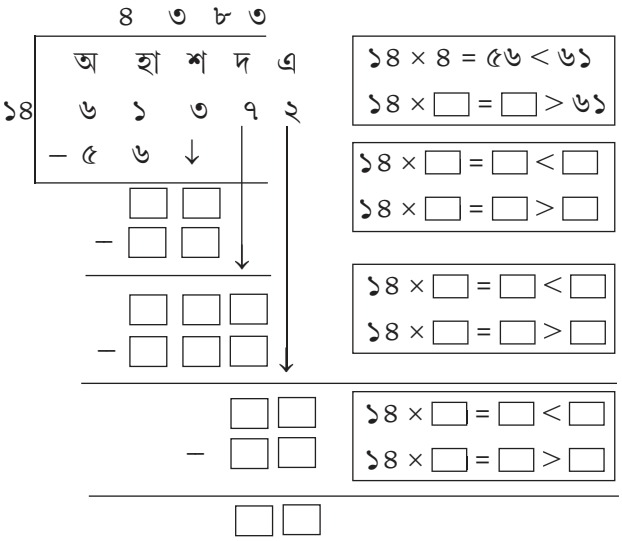

ভাজ্য = □ , ভাজক = □

ভাগফল = □ , ভাগশেষ = □

২১৭৩১৬ ÷ ২৫

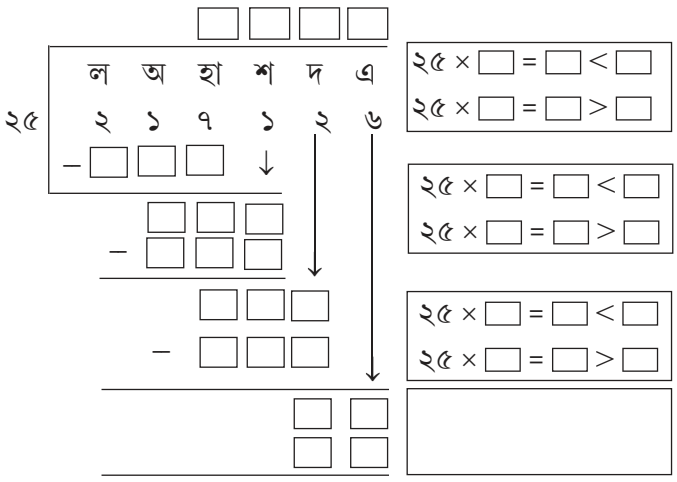

ভাজ্য = □ , ভাজক = □

ভাগফল = □ , ভাগশেষ = □

গুণনীয়ক

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- গুণনীয়ক নির্ণয় করতে পারবে।
- সাধারণ গুণনীয়ক খুঁজে বের করতে পারবে।
- গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় করতে পারবে।

১৮টি টিপ সমান সংখ্যায় কতভাবে সাজাতে পারবো

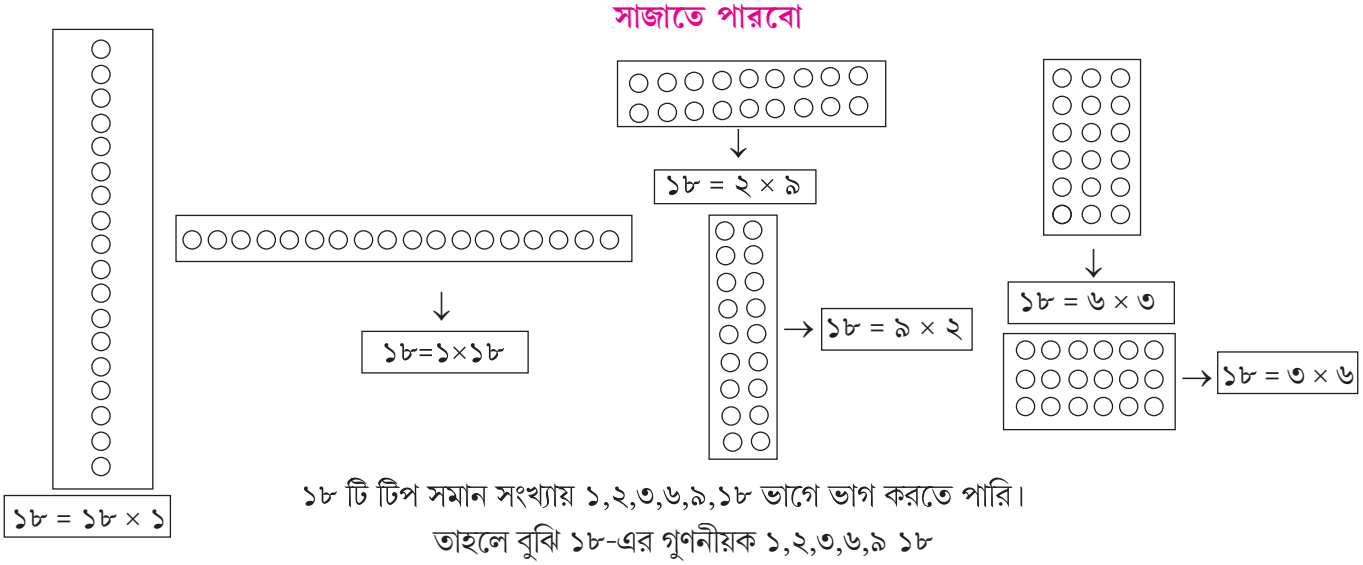

১৮ টি টিপ সমান সংখ্যায় ১,২,৩,৬,৯,১৮ ভাগে ভাগ করতে পারি।

তাহলে বুঝি ১৮-এর গুণনীয়ক ১,২,৩,৬,৯ ১৮

১০টি লজেন্স সমানভাগে ভাগ করে দেবো।
কী কী ভাবে ভাগ করে দিতে পারি দেখি।

১০ = ১ × ১০

১০ = ২ × ৫

১০ = ৫ × ২

১০ = ১০ × ১

১০-এর গুণনীয়কগুলি □, □, □, □

১৬ জন সমান সংখ্যায় ভাগ করে দল গড়ি

১৬ = □ × ১৬ ১৬ = □ × □

১৬ = □ × ৮ ১৬ = □ × □

১৬ = □ × □

১৬-এর গুণনীয়কগুলি □, □, □, □, □

২০ ও ২৫-এর গুণনীয়ক খুঁজি :

২০ = ১ × ২০ ২০ = ৫ × ৪

২০ = ২ × ১০ ২০ = ১০ × ২

২০ = ৪ × ৫ ২০ = ২০ × ১

২০-এর গুণনীয়কগুলি ১, ২, ৪, ৫, ১০, ২০

২৫ = ১ × ২৫

২৫ = ৫ × ৫

২৫-এর গুণনীয়কগুলি ১, ৫, ২৫

২০ ও ২৫-এর সাধারণ গুণনীয়ক গুলি ১ ও ৫

২০ ও ২৫-এর সবচেয়ে বড়ো বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হলো ৫ ।

১২ ও ১৮-এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক খুঁজি

১২ = □ × □ ১২ = □ × □

১২ = □ × □ ১২ = □ × □

১২ = □ × □ ১২ = □ × □

১৮ = □ × □ ১৮ = □ × □

১৮ = □ × □ ১৮ = □ × □

১৮ = □ × □ ১৮ = □ × □

১২-এর গুণনীয়কগুলি □, □, □, □, □, □

১৮-এর গুণনীয়কগুলি □, □, □, □, □, □

১২ ও ১৮-এর সাধারণ গুণনীয়কগুলি □, □, □, □

১২ ও ১৮-এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কগুলি □।

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ককে সংক্ষেপে গ.সা.গু বলি।

সহজে গ.সা.গু খুঁজি :

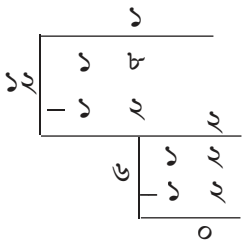

ভাগশেষ দিয়ে ভাজককে ভাগ করি, যতক্ষণ না ভাগশেষ ০ হয়।

খুঁজে পাই ১২ ও ১৮-এর গ.সা.গু ৬।

১৫ ও ৩৬-এর গ.সা.গু খুঁজি :

ভাগশেষ দিয়ে ভাজককে ভাগ করি, যতক্ষণ না ভাগশেষ ০ হয়।

খুঁজে পাই ১৫ ও ৩৬-এর গ.সা.গু ৩।

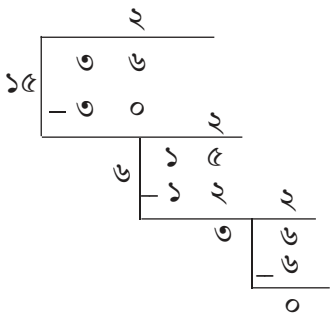

নিজে করি —

২৪ ও ৩২-এর গ.সা.গু —

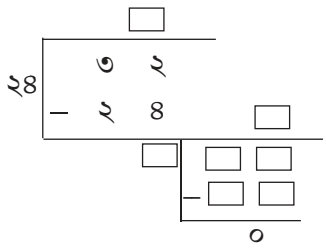

২৪ ও ৩২-এর গ.সা.গু □।

২৫ ও ৩৫-এর গ.সা.গু

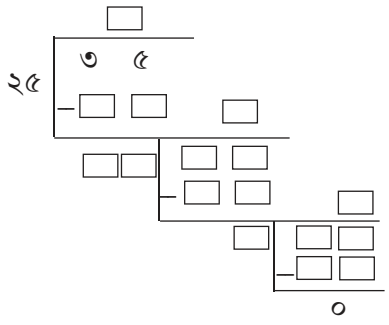

২৫ ও ৩৫-এর গ.সা.গু □।

গুণিতক

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।
- সাধারণ গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।
- লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু নির্ণয় করতে পারবে।

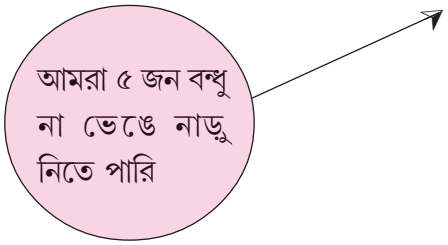

৫ × ১ = ৫, প্রত্যেক ১টি করে নিতে পারি।
৫ × ২ = ১০, প্রত্যেকে ২টি করে নিতে পারি।
৫ × ৩ = ১৫, প্রত্যেকে ৩টি করে নিতে পারি।
৫ × ৪ = ২০, প্রত্যেকে ৪টি করে নিতে পারি।
৫ × ৫ = ২৫, প্রত্যেকে ৫টি করে নিতে পারি।
৫ × ৬ = ৩০, প্রত্যেকে ৬টি করে নিতে পারি।
৫ × ৭ = ৩৫, প্রত্যেকে ৭টি করে নিতে পারি।
৫ × ৮ = ৪০, প্রত্যেকে ৮টি করে নিতে পারি।
৫ × ৯ = ৪৫, প্রত্যেকে ৯টি করে নিতে পারি।
৫ × ১০ = ৫০, প্রত্যেকে ১০টি করে নিতে পারি।

'০' ছাড়া ৫-এর গুণিতকগুলি ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০.....অসংখ্য।

নিজে করি :

৮-এর গুণিতকগুলি → ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

৯-এর গুণিতকগুলি → ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

১০-এর গুণিতকগুলি → ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

বুঝে নিয়ে ফাঁক পূরণ করি :

৩-এর গুণিতকগুলি ৩, ☐, ☐, ১২, ১৫, ☐, ২১, ☐, ☐, ৩০.....

৫-এর গুণিতকগুলি ৫, ☐, ১৫, ☐, ☐, ৩০, ☐, ☐, ☐, ৫০ .....

৩ ও ৫-এর সাধারণ গুণিতকগুলি ১৫, ৩০ .....

৩ ও ৫-এর সবচেয়ে ছোটো বা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ☐।

৪ -এর গুণিতকগুলি ৪, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

৬-এর গুণিতকগুলি ৬, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

৮-এর গুণিতকগুলি ৮, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐, ☐ .....

৪ , ৬ ও ৮ -এর সাধারণ গুণিতকগুলি ☐, ☐.....

৪ , ৬ ও ৮ -এর ল.সা.গু. ☐।

অন্যভাবে ল.সা.গু. খুঁজি :

৬ ও ১০-এর ল.সা.গু.

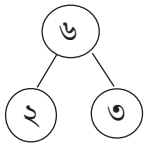

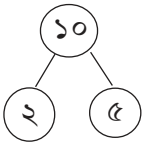

৬ = ২ × ৩

১০ = ২ × ৫

৬ ও ১০-এর সাধারণ উৎপাদক ২

অন্য উৎপাদকগুলি ৩, ৫

∴ ৬ ও ১০-এর ল.সা.গু = ২ × ৩ × ৫ = ৩০

৮ ও ১২-এর ল.সা.গু. খুঁজি :

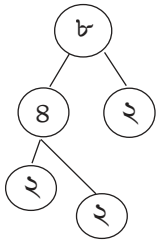

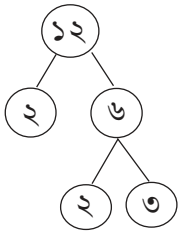

৮ = ☐ × ☐ × ☐

১২ = ☐ × ☐ × ☐

৮ ও ১২-এর সাধারণ্ উৎপাদক = ☐, ☐

৮ ও ১২-এর অন্য উৎপাদকগুলি = ☐, ☐

∴ ৮ ও ১২-এর ল.সা.গু = ☐ × ☐ × ☐

১২ ও ১৫-এর ল.সা.গু. খুঁজি :

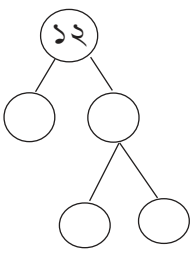

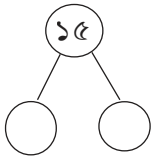

১২ = ☐ × ☐ × ☐

১৫ = ☐ × ☐

১২ ও ১৫-এর সাধারণ্ উৎপাদক = ☐, ☐

১২ ও ১৫-এর অন্য উৎপাদকগুলি = ☐, ☐, ☐

∴ ১২ ও ১৫-এর ল.সা.গু = ☐ × ☐ × ☐ × ☐ = ☐

প্রকৃত ভগ্নাংশ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- প্রকৃত ভগ্নাংশ লিখতে পারবে।
- সমতুল্য ভগ্নাংশ লিখতে পারবে।
- প্রকৃত ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করতে পারবে।
- ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশেগুলির মধ্যে যোগ - বিয়োগ করতে পারবে।

কেক কাটি

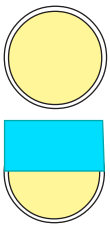

একটি গোটা বা সম্পূর্ণ কেক

কেকের সমান ২ ভাগের ১ ভাগ। একে ছোট করে লিখি $\frac{১}{২}$।

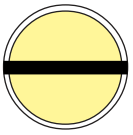

কেকের সমান ২ ভাগ।

গোটা কেকের অংশ হলো $\frac{১}{২}$। এটা ভাঙা অংশ বা ভগ্নাংশ। $\frac{১}{২}$ -এর ১ লব ও ২ হর

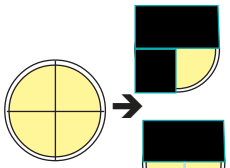

কেকের সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ → $\frac{\square}{\square}$ অংশ

কেকের সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ → $\frac{\square}{\square}$ অংশ

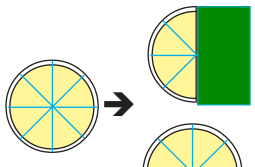

কেকের সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ → $\frac{\square}{\square}$ অংশ

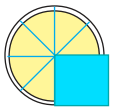

কেকের সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ → $\frac{\square}{\square}$ অংশ

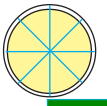

কেকের সমান ৮ ভাগের ৮ ভাগ → $\frac{\square}{\square}$ অংশ ১ বা সম্পূর্ণ অংশ।

ভগ্নাংশগুলির লব < হর, এদের প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।

দেখে বুঝি 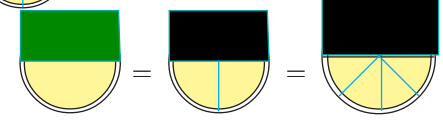 বা $\frac{১}{২}$ অংশ $= \frac{২}{৪}$ অংশ $= \frac{৪}{৮}$ অংশ

এরা একই বা সমতুল্য ভগ্নাংশ ।

অন্যভাবে খুঁজি: $\frac{১}{২} = \frac{১ \times \boxed{২}}{২ \times \boxed{২}} = \frac{২}{৪}$ বা $\frac{১}{২} = \frac{১ \times \boxed{৪}}{২ \times \boxed{৪}} = \frac{৪}{৮}$

$\frac{২}{৪} = \frac{২ \div \boxed{২}}{৪ \div \boxed{২}} = \frac{১}{২}$ বা $\frac{৪}{৮} = \frac{৪ \div \boxed{৪}}{৮ \div \boxed{৪}} = \frac{১}{২}$

ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে ভগ্নাংশের মান একই থাকে।

নিজে করি ঃ

ছবি দেখে সমতুল্য ভগ্নাংশ লিখি —

$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

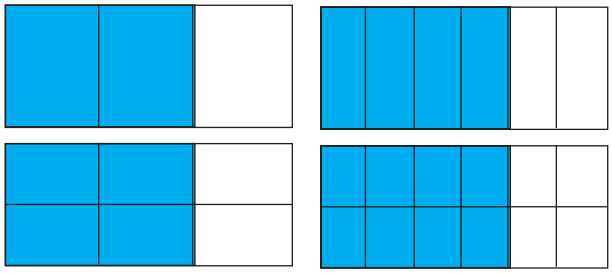

লব ও হরকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করে নতুন নতুন সমতুল্য ভগ্নাংশ বানাই—

$\frac{\boxed{২০}}{\boxed{৩০}} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

ছোট বড়ো খুঁজি : লিলি কেক পেলো $\frac{২}{৬}$ অংশ আর মিতা কেক পেলো $\frac{৩}{৮}$ অংশ। কে বেশি পেলো খুঁজে দেখি।

$\frac{\boxed{২}}{\boxed{৬}} \rightarrow$

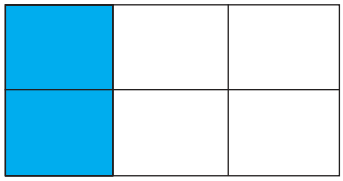

$\frac{\boxed{৩}}{\boxed{৮}} \rightarrow$

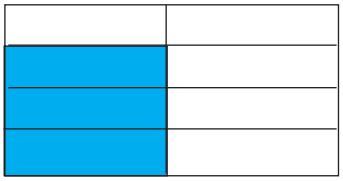

সমতুল্য ভগ্নাংশ খুঁজি:

$\frac{\boxed{২}}{\boxed{৬}} = \frac{\square}{১২} = \frac{৬}{১৮} = \frac{৮}{২৪} = \frac{১০}{৩০} = \frac{\quad}{৩৬} = \ldots$

$\frac{৩}{৮} = \frac{৬}{১৬} = \frac{৯}{২৪} = \frac{\square}{৩২} = \frac{\square}{৪০} = \frac{১৮}{৪৮} = \ldots$

$\frac{৮}{২৪} < \frac{৯}{২৪}$, তাহলে খুঁজে পাই $\frac{২}{৬} < \frac{৩}{৮}$।

$\frac{৮}{২৪}$ ও $\frac{৯}{২৪}$ এদের হর সমান। সমান হর হলে ছোটো বড়ো খোঁজা সহজ হয়।

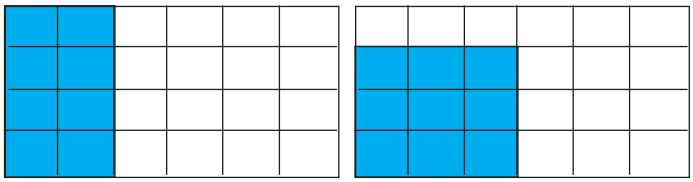

অন্যভাবে খুঁজি:

৬ এর গুণিতক = ৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০..... ৮ এর গুণিতক=৮, ১৬, ২৪, ৩২, ৪০.....

৬ ও ৮ এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক = ২৪, এটা সমতুল্য ভগ্নাংশগুলির হর।

খুঁজে পাই ভগ্নাংশগুলির হরগুলির ল. সা. গু. হবে সমান হরের সমতুল্য ভগ্নাংশগুলির হর।

নিজে করি : $\frac{৩}{১০}, \frac{২}{৫}, \frac{৩}{৪}$ ভগ্নাংশগুলি বড়ো থেকে ছোটো সাজাতে চেষ্টা করি—

$\frac{৩}{১০} = \frac{৬}{\square} = \frac{৯}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \ldots$

$\frac{২}{৫} = \frac{\square}{১০} = \frac{৬}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{২৫} = \frac{\square}{\square} = \ldots \quad \frac{৩}{৪} = \frac{\square}{৮} = \frac{\square}{\square} = \frac{৯}{\square} = \frac{\square}{১৬} = \frac{\square}{২০} = \frac{\square}{\square} = \ldots$

$\frac{\square}{\square} > \frac{\square}{\square} > \frac{\square}{\square}$ অথবা $\frac{\square}{\square} > \frac{\square}{\square} > \frac{\square}{\square}$

বুঝে নিয়ে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করি :

$\frac{১}{৮} + \frac{২}{৮} + \frac{৩}{৮}$

হরগুলি সমান

$= \frac{১ + ২ + ৩}{৮}$

$= \frac{৬}{৮}$

$\frac{৪}{১১} + \frac{৩}{১১} + \frac{২}{১১}$

$= \frac{\square + \square + \square}{১১}$

$= \frac{\square}{\square}$

$\frac{৫}{৭} - \frac{২}{৭}$

হরগুলি সমান

$= \frac{\square - \square}{৭}$

$= \frac{\square}{\square}$

$\frac{১২}{২৫} - \frac{৪}{২৫}$

$= \frac{\square - \square}{\square}$

$= \frac{\square}{\square}$

$\frac{২}{৫} + \frac{১}{৬}$

হরগুলি অসমান, তাই হর সমান করে যোগ করি।

$= \frac{২ \times ৬}{৫ \times ৬} + \frac{১ \times ৫}{৬ \times ৫}$

$= \frac{১২}{৩০} + \frac{৫}{৩০}$

$= \frac{১২ + ৫}{৩০}$

$= \frac{\square}{\square}$

হর সমান করতে ৫ ও ৬ এর ল.সা.গু. খুঁজি।
৫ এর গুণিতক— ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, (৩০), ৩৫.....
৬ এর গুণিতক-৬, ১২, ১৮, ২৪, (৩০), ৩৬, ৪২...
৫ ও ৬ এর ল.সা.গু=৩০

$$\frac{৫}{৮} + \frac{৭}{১২}$$

$$= \frac{৫ \times \square}{৮ \times \square} + \frac{৭ \times \square}{১২ \times \square}$$

$$= \frac{\square}{২৪} + \frac{\square}{২৪}$$

$$= \frac{\square + \square}{\square}$$

$$= \frac{\square}{\square}$$

৮ ও ১২ এর ল.সা.গু. খুঁজি।

৮ এর গুণিতক— ৮, ১৬, (২৪), ৩২, ৪০, (৪৮) .....

১২ এর গুণিতক-১২, (২৪), ৩৬, (৪৮), ৬০...

৮ ও ১২ এর ল.সা.গু= $\square$

$$\frac{৩}{১০} - \frac{১}{২০}$$

$$= \frac{৩ \times \square}{১০ \times \square} - \frac{১}{২০}$$

$$= \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square}$$

$$= \frac{\square - \square}{\square}$$

$$= \frac{\square}{\square}$$

১০ এর গুণিতক—১০, ২০, ৩০.....

২০ এর গুণিতক-২০, ৪০, ৬০...

১০ ও ২০ এর ল.সা.গু= $\square$

অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- মিশ্র ভগ্নাংশ লিখতে পারবে।
- মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লিখতে পারবে।
- অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে।
- মিশ্র ভগ্নাংশ বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মধ্যে যোগ - বিয়োগ করতে পারবে।

কেকের অংশ জুড়ি

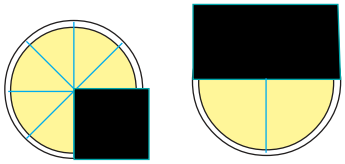

$\frac{৩}{৪} + \frac{২}{৪}$

৫টি অংশকে অন্যভাবে মিলিয়ে দেখি।

$= \frac{৩ + ২}{৪}$

$= \frac{৫}{৪}$

লব > হর, একে বলে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ।

বুঝে পেলাম $\frac{৫}{৪} = ১\frac{১}{৪}$

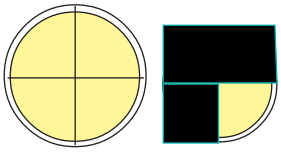

$\frac{৪}{৪} + \frac{১}{৪}$

$\frac{৪}{৪}$ অংশ = ১ অংশ
বা সম্পূর্ণ অংশ

$= ১ + \frac{১}{৪}$

(সম্পূর্ণ অংশ + ভগ্নাংশ) একে বলে মিশ্র ভগ্নাংশ।

$= ১\frac{১}{৪}$

= ১ পূর্ণ ৪ ভাগের ১ ভাগ বা ১ পূর্ণ ১-এর ৪

মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করি ঃ

$১\frac{১}{৪} = ১ + \frac{১}{৪} = \frac{৪}{৪} + \frac{১}{৪} = \frac{৪ + ১}{৪} = \frac{\square}{\square}$

একেবারে করি, $১\frac{১}{৪} = \frac{১ \times ৪ + ১}{৪} = \frac{৪ + ১}{৪} = \frac{\square}{\square}$

$২\frac{১}{৪} = ২ + \frac{১}{৪} = ১ + ১ + \frac{১}{৪}$

$= \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = \frac{\square + \square + \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

একেবারে, করি $২\frac{১}{৪} = \frac{\square \times \square + \square}{\square} = \frac{\square + \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

$৩\frac{২}{৫} = \frac{\square \times \square + \square}{\square} = \frac{\square + \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থেকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করিঃ

$\frac{২৫}{৪} = ৬ + \frac{১}{৪} = ৬\frac{১}{৪}$

$$\begin{array}{r|l} & ৬ \\ \hline ৪ & ২\ ৫ \\ & -২\ ৪ \\ \hline & ১ \end{array}$$

২৫ এর মধ্যে ৪ ছয়বার আসে।

$\frac{৩৩}{৭} = \square + \frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

$$\begin{array}{r|l} & \square \\ \hline ৭ & ৩\ ৩ \\ & -\square\ \square \\ \hline & \square \end{array}$$

$\frac{৪৯}{৯} = \square\frac{\square}{\square}$

$$\begin{array}{r|l} & \square \\ \hline ৯ & ৪\ ৯ \\ & -\square\ \square \\ \hline & \square \end{array}$$

মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগঃ

$৮\frac{১}{৪} + ২\frac{১}{৫}$

$= (৮+২) + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৫}$

$= ১০ + \frac{১\times৫}{৪\times৫} + \frac{১\times৪}{৫\times৪}$

$= ১০ + \left(\frac{৫}{২০} + \frac{৪}{২০}\right)$

$= ১০ + \left(\frac{৫+৪}{২০}\right)$

$৩\frac{১}{৫} + ২\frac{১}{৬}$

$= (৩+২) + \left(\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}\right)$

$= \square + \left(\frac{\square\times\square}{\square\times\square} + \frac{\square\times\square}{\square\times\square}\right)$

$= \square + \left(\frac{\square}{৩০} + \frac{\square}{৩০}\right)$

$= \square + \left(\frac{\square+\square}{\square}\right)$

$২\frac{১}{৬} - ১\frac{১}{৫}$

$= \frac{২\times৬+১}{৬} - \frac{১\times৫+১}{৫}$

$= \frac{১৩}{৬} - \frac{৬}{৫}$

$= \frac{১৩\times৫}{৬\times৫} - \frac{৬\times৬}{৫\times৬}$

$= \frac{৬৫}{৩০} - \frac{৩৬}{৩০}$

$= ১০ + \frac{৯}{২০}$ $= \square + \frac{\square}{\square}$ $= \frac{৬৫ - ৩৬}{৩০}$

$= ১০\frac{৯}{২০}$ $= \square\frac{\square}{\square}$ $= \frac{২৯}{৩০}$

$৩\frac{১}{৪} - ২\frac{১}{৩} = \frac{\square \times \square + ১}{৪} - \frac{\square \times \square + ১}{৩}$

$= \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} - \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{\square}{১২} - \frac{\square}{১২} = \frac{\square}{\square}$

পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের পরিসীমা নির্ণয় করতে পারবে।
- সাধারণ সূত্র থেকে আয়তাকার ও বর্গাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে।
- সাধারণ সূত্র থেকে আয়তাকার ও বর্গাকার ক্ষেত্রের ধারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবে।

বাগানের ধারে বেড়া দিই

ভোলা মালির বাগানে রোজ গরু ঢুকে যায়, তাই বেড়া দিতে হবে। হিসেব করে দেখি কতটা লম্বা বেড়ার প্রয়োজন।

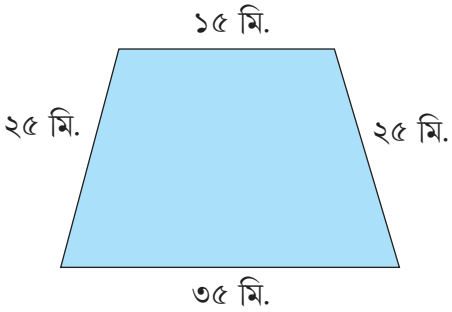

ধারের দৈর্ঘ্য ১৫ মি. + ২৫ মি. + ২৫ মি. + ৩৫ মি. = ১০০ মি.

এই ১০০ মিটার হলো বাগানের পরিসীমা।

যেকোন চিত্র বা ক্ষেত্রের ধারগুলির মোট দৈর্ঘ্য হলো ক্ষেত্রটির পরিসীমা

ভোলা মালির দেখাদেখি রতনেরও ইচ্ছে হলো তার নিজের বাগানটা বেড়া দিয়ে ঘিরতে। হিসেব করে দেখি রতনের বাগান ঘিরতে কতটা লম্বা বেড়ার প্রয়োজন।

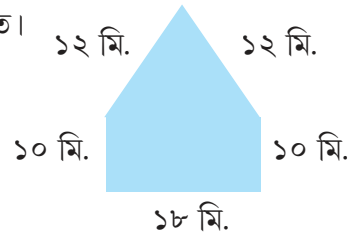

বাগানের পরিসীমা = ☐ মি. + ☐ মি. + ☐ মি. + ☐ মি. + ☐ মি.

= ☐ মি.

রতনের বাগান ঘিরতে ☐ মিটার বেড়া লাগবে।

হুসেন মিঙা বেড়া বাঁধে। আজ সে ঈশমের বাড়ির চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। হিসেব করে দেখি হুসেন মিঙা কতটা লম্বা বেড়া লাগিয়েছে।

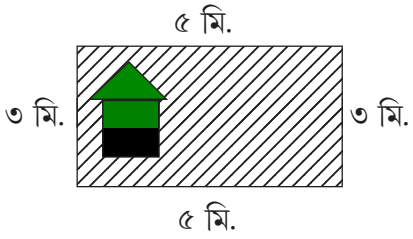

ঈশমের বাড়ির জমিটা আয়তাকার ক্ষেত্র।

এই লম্বা ধারকে দৈর্ঘ্য আর অন্য ধারকে প্রস্থ বলে।

দৈর্ঘ্য = ৫ মি.

প্রস্থ = ৩ মি.

জমির পরিসীমা = ৫ মি. + ৩ মি. + ৫ মি. + ৩ মি. = ১৬ মি.

(৫ + ৩) দুবার আসছে।

অন্যভাবে সাজাই, জমির পরিসীমা = (৫+৩) মি. + (৫+৩) মি.

= ২ × (৫+৩) মি.

খুঁজে পাই আয়তাকার চিত্র বা ক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

আবার খুঁজে পাই ১৬ ÷ ২ = ৮ এবং ৫ + ৩ = ৮

তাহলে, আয়তাকার চিত্র বা ক্ষেত্রের | পরিসীমা ÷ ২ = দৈর্ঘ্য+প্রস্থ |

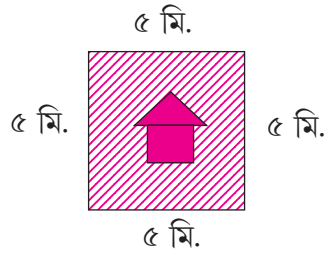

আমি ভাবছি হুসেন মিঙাকে দিয়ে আমার বাড়ির চারপাশটাও বেড়া দিয়ে বাঁধিয়ে নেবো। হিসেব করে দেখি কতটা লম্বা বেড়া লাগবে।

আমার বাড়ির জমিটা বর্গাকার ক্ষেত্র। এর প্রতিটি ধার ☐। ।

প্রতিটি ধার বা বাহুর দৈর্ঘ্য = ৫ মি.

জমির পরিসীমা = ৫ মি. + ৫ মি. + ৫ মি. + ৫ মি. = ২০ মি.

৫ চারবার আসছে।

অন্যভাবে সাজাই, জমির পরিসীমা = (৪ × ৫) মি.

খুঁজে পাই বর্গাকার চিত্র বা ক্ষেত্রের | পরিসীমা = ৪ × একটি বাহুর দৈর্ঘ্য |

আবার খুঁজে পাই ২০ ÷ ৪ = ৫

তাহলে বর্গাকার চিত্র বা ক্ষেত্রের | একটি বাহুর দৈর্ঘ্য = পরিসীমা ÷ ৪ |

নিজে করি :

১৪ ফুট
১১ ফুট ☐ ১১ ফুট
১৪ ফুট

পরিসীমা = ২ × (☐ + ☐) ফুট
= ২ × ☐ ফুট
= ☐ ফুট

১০ ফুট
পরিসীমা = ৩৬ ফুট
১০ ফুট

দৈর্ঘ্য + প্রস্থ = ☐ ফুট ÷ ২
= ☐ ফুট
প্রস্থ = (☐ – ১০) ফুট
= ☐ ফুট

৬ মি. পরিসীমা = ৩০ মিটার ৬ মি.

দৈর্ঘ্য + প্রস্থ = ☐ মি. ÷ ২
= ☐ মি.
দৈর্ঘ্য = (☐ – ৬) মি.
= ☐ মি.

১৫ ফুট
১৫ ফুট ☐ ১৫ ফুট
১৫ ফুট

পরিসীমা = ৪ × ☐ ফুট
= ☐ ফুট

পরিসীমা = ৫৬ ফুট

বাহুর দৈর্ঘ্য = ☐ ফুট ÷ ৪
= ☐ ফুট

৬ মি. পরিসীমা = ৮৪ মি. ৬ মি.

বাহুর দৈর্ঘ্য = ☐ মি. ÷ ৪
= ☐ মি.

কাগজের মাপ খুঁজি

চিনু দাদু পল্টু আর বল্টুকে কার্ড বানানোর জন্য দুটি রঙিন কাগজ দিয়েছেন। পল্টু ও বল্টু দুজনেই স্কেল দিয়ে কাগজের ধার মেপে দেখল, কিন্তু কার কাগজটা বড়ো কেউ বুঝতে পারছে না।

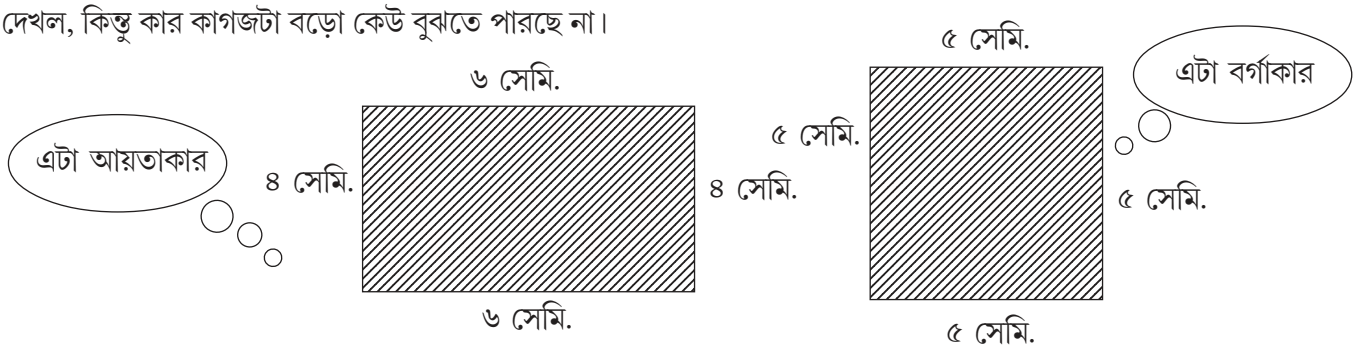

চিনু দাদু বললেন যার কাগজের টুকরো বেশি জায়গা দখল করেছে তারটা বড়ো।

কোনো ক্ষেত্র যতটুকু জায়গা দখল করে তার পরিমাপই ঐ ক্ষেত্রের **ক্ষেত্রফল**।

দাদু কিছু একই মাপের বর্গাকার কাগজের টুকরো দিলেন।

ক্ষেত্রের ধার সেমি. হলে ক্ষেত্রফল বর্গসেমি. হবে।

১ সেমি. ধারের বর্গাকার কাগজের টুকরো জায়গা দখর করে **১ বর্গ সেমি.**।

টুকরো দুটো ঢাকতে এরকম কতগুলি ছোট কাগজের টুকরো লাগছে খুঁজে দেখি।

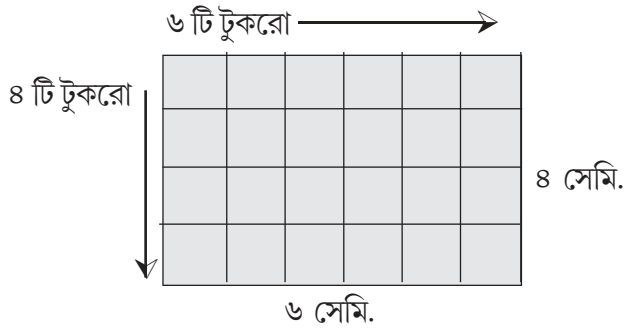

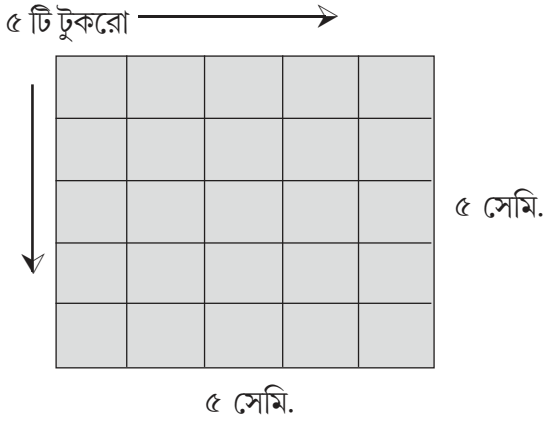

২৪ টি টুকরো =২৪ বর্গ সেমি.

খুঁজে পেলাম = ২৪ বর্গ সেমি.

= ৬ সেমি. × ৪ সেমি.

আয়তাকার ক্ষেত্রের-

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

দৈর্ঘ্য = ক্ষেত্রফল ÷ প্রস্থ

প্রস্থ = ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য

২৪ ÷ ৪= ৬
২৪ ÷ ৬= ৪

২৫টি টুকেরা = ২৫ বর্গ সেমি.

খুঁজে পেলাম = ২৫ বর্গ সেমি.

= ৫ সেমি. × ৫ সেমি.

বর্গাকার ক্ষেত্রের -

ক্ষেত্রফল = বাহুর দৈর্ঘ্য × বাহুর দৈর্ঘ্য

ছক পূরণ করি :

আয়তাকার ক্ষেত্র

দৈর্ঘ্য = ক্ষেত্রফল ÷ প্রস্থ	প্রস্থ = ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য	ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
৮ মি.	৬ মি.	☐ × ☐ বর্গ মি. = ☐ বর্গ মি.
☐ ÷ ☐ = ☐ ফুট	১০ ফুট	১২০ বর্গ ফুট
৫০ ফুট	(☐ ÷ ☐) ফুট = ☐ ফুট	১৫০ বর্গ ফুট

বর্গাকার ক্ষেত্র

একটি বাহুর দৈর্ঘ্য	ক্ষেত্রফল = বাহুর দৈর্ঘ্য × বাহুর দৈর্ঘ্য
৬ মিটার	৬ মি. × ৬ মি. = ৩৬ বর্গ মি.
৮ মিটার	☐ মি. × ☐ মি. = ☐ বর্গ মি.
১০ ফুট	☐ ফুট × ☐ ফুট = ☐ বর্গ ফুট
৪ মিটার	১৬ বর্গ মি. ১৬ বর্গ মি. = ৪ মি. × ৪ মি.
☐ মিটার	৪৯ বর্গ মি. ৪৯ বর্গ মি. = ☐ মি. × ☐ মি.
☐ ফুট	৮১ বর্গ ফুট ☐ বর্গ ফুট = ☐ ফুট × ☐ ফুট

সরলের নিয়ম

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- বাস্তব সমস্যাকে সহজ অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।
- অঙ্কের ভাষায় প্রকাশিত সরল অঙ্ক সমাধান করতে পারবে।

বুঝে নিয়ে নিজে করি :

( ) – এই চিহ্নটি প্রথম বন্ধনী। { } – এই চিহ্নটি দ্বিতীয় বন্ধনী। [ ] – এই চিহ্নটি তৃতীয় বন্ধনী।

সরল অঙ্কে যে কাজগুলি পরপর করতে হয়—

প্রথম বন্ধনী → দ্বিতীয় বন্ধনী → তৃতীয় বন্ধনী, ভাগ → গুণ → যোগ → বিয়োগ

বন্ধনী ও সংখ্যার মাঝে কোন চিহ্ন না থাকলে গুণ চিহ্ন (‘এর’) আছে বুঝতে হবে। ‘এর’ কাজ সবার আগে করতে হবে, তারপর ভাগ, গুণ, যোগ, বিয়োগ করতে হবে।

[{(১৫ – ৭) × ৬} ÷ ৪] + ৫
= [{ ৮ × ৬} ÷ ৪] + ৫ ( ) – এর কাজ করি
= [৪৮ ÷ ৪] + ৫ { } – এর কাজ করি
= ১২ + ৫ [ ] – এর কাজ করি
= ১৭

[{(৮ + ৪) – ১০} + ২৫] ÷ ৩
= [{ □ – ১০} + ২৫] ÷ ৩
= [□ + ২৫] ÷ ৩
= □ ÷ ৩
= □

[{৫৫ – ২(৮ + ৫)} + ৪] – ৩
= [{৫৫ – ২ × ১৩} + ৪] – ৩
= [{৫৫ – ২৬} + ৪] – ৩
= [□ + ৪] – ৩
= □ – ৩
= □

বন্ধনী ও সংখ্যার মাঝে কোন চিহ্ন নেই তাই × করি।

‘এর’ (×) এর কাজ আগে করি।

[{ ৩ (১২ + ৬) ÷ ৯} + ১৫] – ৯
= [{ ৩ × □ ÷ ৯} + ১৫] – ৯
= [{ □ ÷ ৯} + ১৫] – ৯
= [□ + ১৫] – ৯
= □ – ৯
= □

‘এর’ (×) এর কাজ আগে করি।

২৭ – {৩ (৫ – ২) + ২ (৮ – ৩)}
= □
= □
= □
= □

[{২ (৩০ ÷ ৬) ÷ ৫} – ২] + ১৮
= □
= □
= □
= □

দশমিক ভগ্নাংশ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- সামান্য ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- সামান্য ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর করতে পারবে।
- দশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশের মধ্যে বড়ো ছোটো নির্ণয় করতে পারবে।

ব্লকের সংখ্যা গুনি

→১টি ব্লক →১০টি ব্লক দিয়ে তৈরি ১টি স্তম্ভ

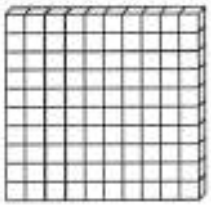 →১০০টি ব্লক দিয়ে তৈরি ১টি ফলক

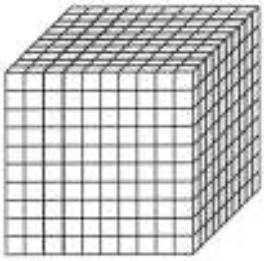 →১০০০টি ব্লক দিয়ে তৈরি ১টি ঘনক

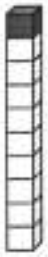

১০টির মধ্যে ১টি রং করা হয়। রং হয়েছে সমান ১০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{১০}$ অংশ।

$\frac{১}{১০}$ -কে অন্যভাবে লেখা হয় [.১]। ০.১-কে বলা হয় [১ দশমাংশ] বা [দশমিক এক]।

$\frac{১}{১০}$ -কে বলে [সামান্য ভগ্নাংশ]। .১-কে বলে [দশমিক ভগ্নাংশ]। তাহলে $\frac{১}{১০}$ = .১।

রং হয়েছে সমান ১০ ভাগের ৩ ভাগ = $\frac{৩}{১০}$ অংশ = .৩ বা দশমিক তিন

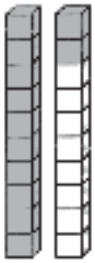

ধূসর রং হয়েছে

= ১টি সম্পূর্ণ স্তম্ভ এবং একটি স্তম্ভের সমান ১০ ভাগের ২ ভাগ

= ১ + $\frac{২}{১০}$ = ১ $\frac{২}{১০}$

১ $\frac{২}{১০}$ -কে অন্যভাবে লেখা হয় ১.২ বা এক দশমিক দুই। তাহলে ১ $\frac{২}{১০}$ = ১.২।

ফাঁকা ঘর পূরণ করি ঃ

মিশ্র ভগ্নাংশ	বিস্তার করে লিখি	দশমিক ভগ্নাংশ	দশক	একক	দশাংশ
১২ $\frac{৭}{১০}$	১২ + $\frac{৭}{১০}$	১২.৭	১	২	৭
১৫ $\frac{৮}{১০}$	□ + $\frac{□}{□}$				

১০০টির মধ্যে ১টি রং করা।

রং হয়েছে সমান ১০০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{১০০}$ অংশ।

$\frac{১}{১০০}$ -কে অন্যভাবে লেখা হয় .০১।

.০১-কে বলা হয় ১ শতাংশ বা দশমিক শূন্য এক। তাহলে $\frac{১}{১০০}$ = .০১।

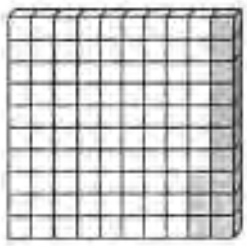

রং করা ১টি ফলকের সমান ১০০ ভাগের ১৩ ভাগ = $\frac{১৩}{১০০}$ অংশ।

$\frac{১৩}{১০০}$ -কে অন্যভাবে লেখা হয় .১৩ বা দশমিক এক তিন।

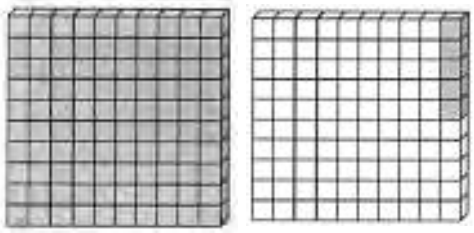

রং করা ১টি সম্পূর্ণ ফলক এবং একটি ফলকের সমান
১০০ ভাগের ৫ ভাগ

= ১ + $\frac{৫}{১০০}$ অংশ = ১ $\frac{৫}{১০০}$ অংশ

১ $\frac{৫}{১০০}$-কে অন্যভাবে লেখা হয় ১.০৫ বা এক দশমিক শূন্য পাঁচ।

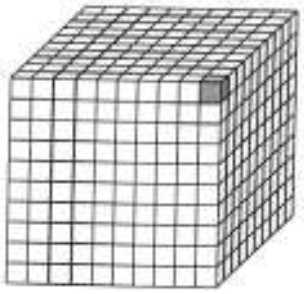

১০০০টির মধ্যে ১টি রং করা।

রং হয়েছে সমান ১০০০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{১০০০}$ অংশ।

$\frac{১}{১০০০}$ -কে অন্যভাবে লেখা হয় .০০১।

.০০১-কে বলা হয় ১ সহস্রাংশ বা দশমিক শূন্য শূন্য এক।

তাহলে $\frac{১}{১০০০}$ =.০০১।

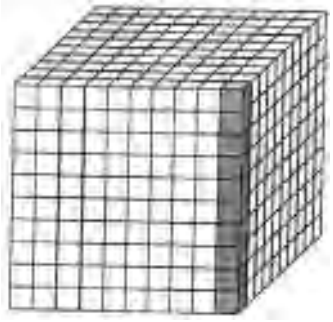

১০০০ টির মধ্যে ১০টি রং করা।

রং হয়েছে সমান ১০০০ ভাগের ১০ ভাগ

= $\frac{১০}{১০০০}$ অংশ = .০১০ বা .০১

দশমিকের একবারে শেষে শূন্যের কোনো দরকার নেই।

আসলে .০১ = $\frac{১}{১০০}$ = $\frac{১\times১০}{১০০\times১০}$ = $\frac{১০}{১০০০}$ =.০১০

	দশাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ	
.১	১			দশমিক বিন্দুর পর এক ঘর।
.০১	০	১		দশমিক বিন্দুর পর দুই ঘর।
.০০১	০	০	১	দশমিক বিন্দুর পর তিন ঘর।

কোনটি বড়ো খুঁজি :

.০৫ ও .০০৫	$.০৫ = \frac{৫}{১০০} = \frac{৫\times১০}{১০০\times১০} = \frac{৫০}{১০০০}$	সমান ১০০০ ভাগের ৫০ ভাগ।	.০৫ > .০০৫
	$.০০৫ = \frac{৫}{১০০০}$	সমান ১০০০ ভাগের ৫ ভাগ।	
.০২ ও .০২৫	$.০২= \frac{\square}{\square} = \frac{\square\times১০}{\square\times১০} = \frac{\square}{\square}$	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ।	☐ > ☐
	$.০২৫= \frac{\square}{\square}$	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ।	
.১২ ও .১১৫	$.১২= \frac{\square}{\square} = \frac{\square\times১০}{\square\times১০} = \frac{\square}{\square}$	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ।	☐ > ☐
	$.১১৫= \frac{\square}{\square}$	সমান ☐ ভাগের ☐ ভাগ।	

ফাঁকা ঘর পূরণ করি ঃ

দশমিক ভগ্নাংশ	শতক	দশক	একক	দশাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ	বিস্তার করে লিখি
১২.১২৫		১	২	১	২	৫	$১০ + ২ + \frac{১}{১০} + \frac{২}{১০০} + \frac{৫}{১০০০}$
২৫.৩৫৬		☐	☐	☐	☐	☐	☐
৩২৫.৫৬	☐	☐	☐	☐	☐		☐

বিন্দু, রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি অঙ্কন করতে পারবে।
- সরলরেখাংশ ও বক্ররেখাংশ অঙ্কন করতে পারবে।

পেন্সিল দিয়ে দাগ টানি

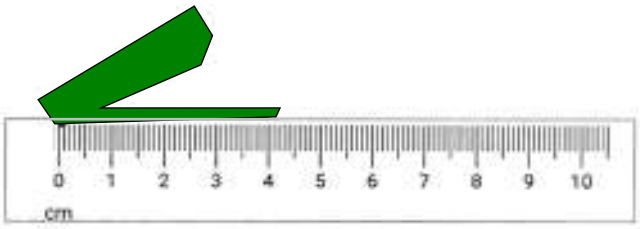

স্কেলের বড়ো দাগগুলি সেন্টিমিটার মাপ। ০,১,২..... এইভাবে দাগ কাটা। দুটি বড়ো দাগের মাঝের দৈর্ঘ্য ১ সেমি.।

বড়ো দাগগুলির মাঝের ছোট দাগগুলি মিলিমিটার মাপ।
দুটি বড়ো দাগের মাঝের দৈর্ঘ্য সমান ১০ ভাগ করা। ১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার
১ মিলিমিটার = এক সেমি.- এর ১০ ভাগের ১ ভাগ = $\frac{১}{১০}$ সেমি. = .১ সেমি.।

৪ সেমি. দাগ টানি

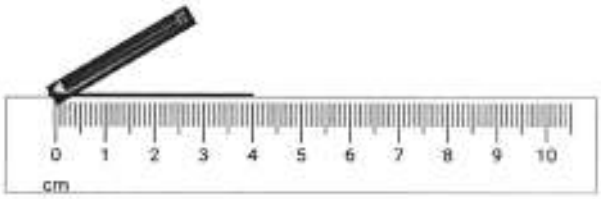

০ থেকে শুরু করে বড়ো দাগ ৪ পর্যন্ত টানি।

A _____ B দাগটির নাম দিই $\overline{AB}$ $\boxed{\overline{AB} = ৪ \text{ সেমি.}}$

৪.৫ সেমি. দাগ টানি —

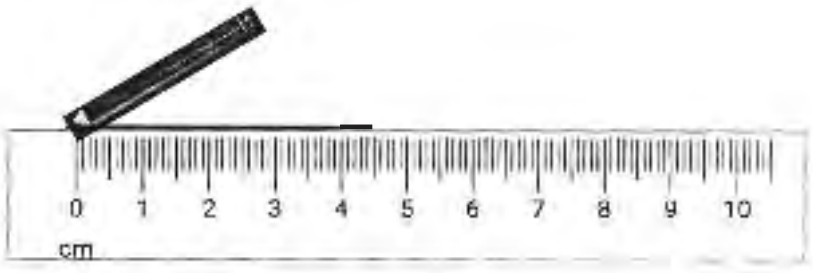

৪.৫ সেমি. = ৪ সেমি. ৫ মিলিমি.
তাই বড়ো দাগ ৪ ঘরের পর আরও ছোট দাগ ৫ ঘর পর্যন্ত টানি।

C _____ D দাগটির নাম দিই $\overline{CD}$ $\boxed{\overline{CD} = ৪.৫ \text{ সেমি.}}$

এই ধরনের দাগগুলি হলো সরলরেখাংশ

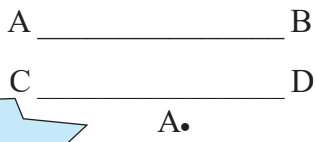

এই দাগের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কমতে কমতে খুব ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হয়।

এরকম অসংখ্য বিন্দু থাকে রেখাংশের মধ্যে।

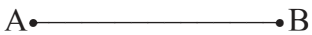

এখানে A ও B প্রান্তবিন্দু। বিন্দু দুটি সোজাসুজি জুড়লে $\overline{AB}$ সরলরেখাংশ পাই।

সরলরেখাংশের দুইপ্রান্ত যত খুশি বাড়ানো যায়, তখন তার কোনো প্রান্ত বিন্দু থাকেনা।

এটি **সরলরেখা**। একে লিখি $\overleftrightarrow{AB}$।

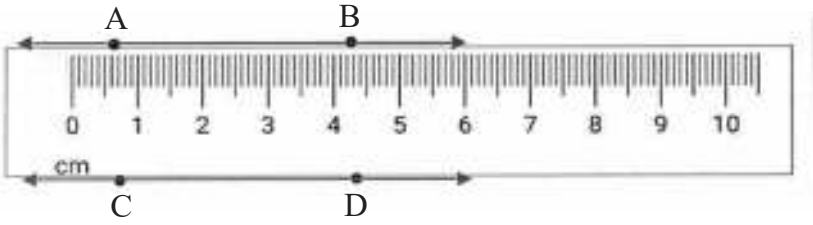

$\overleftrightarrow{AB}$ ও $\overleftrightarrow{CD}$ সামতলিক সরলরেখাদুটি কখনো পরস্পরকে ছেদ করবে না। এদের **সমান্তরাল সরলরেখা** বলে।

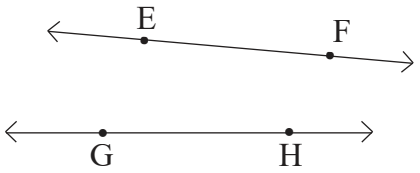

$\overleftrightarrow{EF}$ ও $\overleftrightarrow{GH}$ সরলরেখাদুটি পরস্পরকে ছেদ করবে। এদের **অসমান্তরাল সরলরেখা** বলে।

দাগগুলি সোজা না হয়ে যদি আঁকাবাঁকা হতো, ঠিক যেমনটি অ্যাসবেস্টসের ধার হয়। এরকম রেখাকে **বক্ররেখাংশ** বলে।

আবার টর্চ থেকে যখন আলো বেড়োয় তখন মনে হয় যেনো একটি বিন্দু থেকে অনেক আলোর সরলরেখা বেরোচ্ছে। এই রেখাগুলোকে রশ্মি বলে। এদের একটি প্রান্তবিন্দু আছে কিন্তু অপর প্রান্ত বিন্দু নেই। একে লিখি $\overrightarrow{GH}$ এইভাবে।

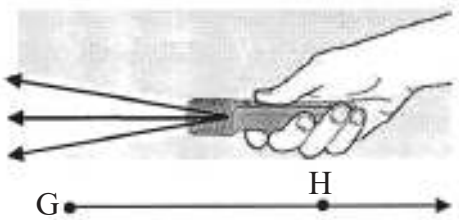

ছবি দেখে সরলরেখা, সরলরেখাংশ ও রশ্মির নাম লিখি এবং কোনগুলি সমান্তরাল সরলরেখাংশ খুঁজে লিখি :

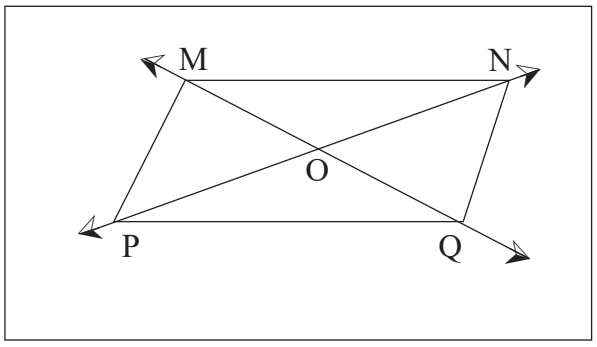

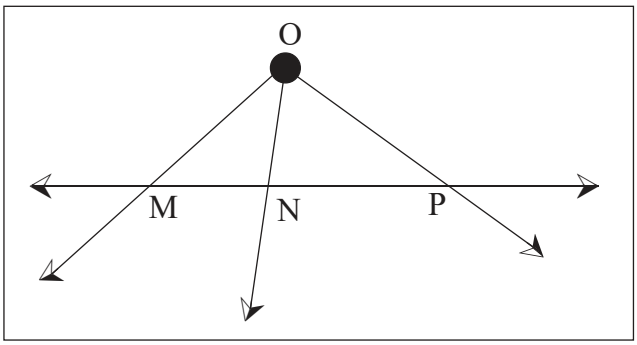

কোণের পরিমাপ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- বিভিন্ন ধরনের কোণ অঙ্কন করতে পারবে।
- চাঁদা ব্যবহার করতে পারবে।

ঘড়ির দুটো কাঁটার মাঝের জায়গাটা কোণ ঘড়ির কাঁটা দুটি ঠিক যেনো রশ্মি, একটি প্রান্তবিন্দু থেকে বেড়িয়ে একটির সঙ্গে আরেকটি কোণ তৈরি করে ঘুরতে থাকে।

কোণ মাপার একটি একক '°' (ডিগ্রি)।

দুটি রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত থেকে কোণ উৎপন্ন করে।

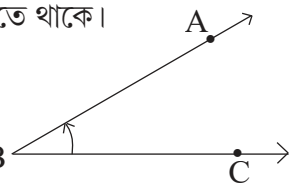

$\overrightarrow{BA}$ ও $\overrightarrow{BC}$ রশ্মিদুটি B বিন্দুতে কোণ তৈরি করেছে। B কোণের শীর্ষবিন্দু ।

কোণ লিখি, $\angle ABC$ বা $\angle CBA$ এইভাবে। চাঁদার সাহায্যে কোণ মাপা হয়।

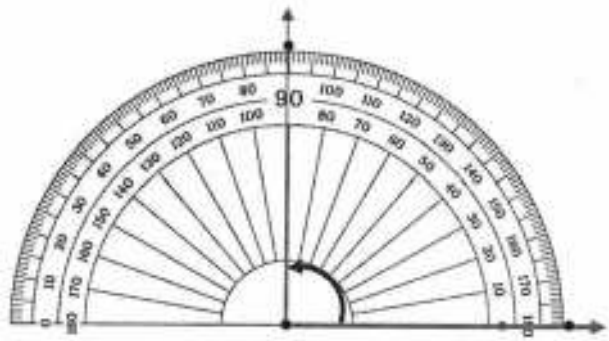

৯০° বা এক সমকোণ

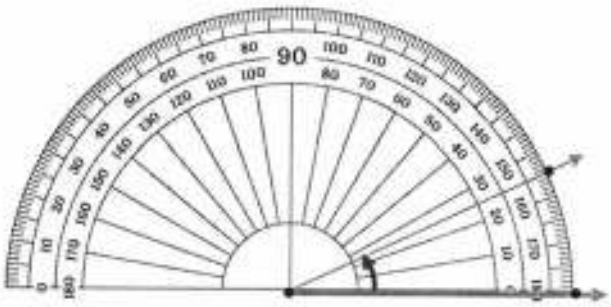

২৫°

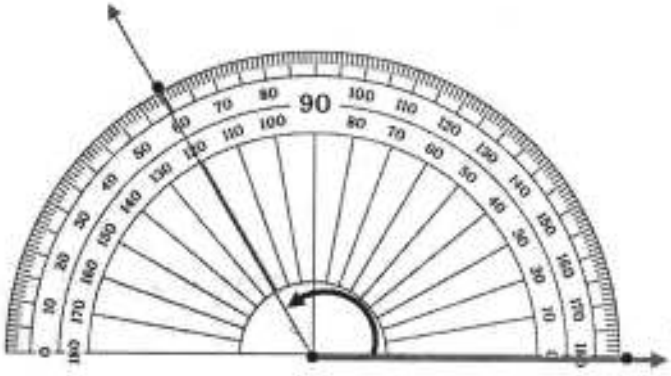

১২০°

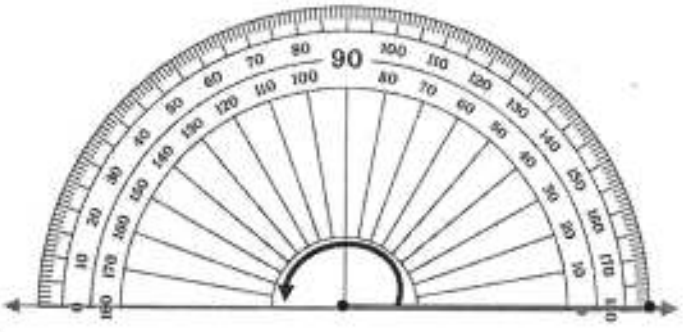

১৮০° বা এক সরলকোণ

জেনে রাখি ৯০° বা এক সমকোণের থেকে ছোটো কোণকে সূক্ষ্মকোণ বলে। ৯০° বা এক সমকোণের থেকে বড়ো কিন্তু ১৮০° বা এক সরলকোণের থেকে ছোটো কোণকে স্থূলকোণ বলে।

চিত্রলেখ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- উপযুক্ত স্কেলে তথ্যকে চিত্রলেখের সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারবে।

খামার ঘুরি

স্কুল থেকে আজ সকলকে গ্রামের খামার ঘুরতে নিয়ে আসা হয়েছে। স্যার বলেছেন কে কতগুলি পশু বা পাখি দেখেছো তা নোটবুকে লিখে রাখতে। একই পশু বা পাখি বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে রাখা আছে, তাই রিমিল সংক্ষেপে লেখার জন্য একটা কৌশল বের করেছে।

১টির জন্য , ২ টির জন্য , ৩ টির জন্য , ৪ টির জন্য এবং ৫ টির জন্য চিহ্ন

রিমিলের নোটবুকের চিহ্ন দেখে হিসেব করি খামারে কোন পশু কয়টি আছে —

গরু		
ছাগল		
মহিষ		৮টি
খরগোস		
কুকুর		
গিনিপিগ		

চেষ্টা করে দেখিতো আমার নোটবুকে সংখ্যার বদলে চিহ্ন আঁকতে পারি কিনা —

খাকী হাঁস		২৫টি
ক্যাম্পবেল হাঁস		১২টি
লেইয়ার মুরগি		৩০টি
বয়লার মুরগি		২৭টি
কোয়েল		২০টি
পায়রা		১০টি

ঘনবস্তু

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- বিভিন্ন ধরনের ঘনবস্তু চিনে তাদের তলের প্রকৃতি প্রকাশ করতে পারবে।
- ঘনবস্তুর তলসংখ্যা, ধার সংখ্যা, শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে।

চেনা জিনিসের নাম লিখি

এই ধরনের বস্তুগুলি বাতাস সরিয়ে কিছুটা জায়গা দখল করে। এদের ঘনবস্তু বলে। এই বস্তুগুলির উপর হাত বুলাতে আমরা তল অনুভব করি।

এর তলের উপর স্কেল রাখলে স্কেলটি তলের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে থাকে। এরকম তল সমতল।

এর তলের উপর স্কেল রাখলে স্কেলটি তলের সাথে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে থাকে। এরকম তল বক্রতল।

তল

দুটি তল যেখানে মিশেছে সেটি প্রান্তরেখা বা ধার। এই ধার সরলরেখাংশ বা বক্ররেখাংশ হতে পারে।

তলের শীর্ষবিন্দু

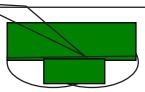

ঘনবস্তুর নাম জানি ও বুঝে ছক পূরণ করিঃ

		তলের সংখ্যা	তলের প্রকৃত (সমতল/বক্রতল)	ধারের সংখ্যা	শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা	তলের ধরন (ছবি আঁকি)
	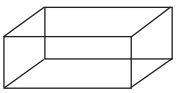 আয়তঘন বা সমকোণী চৌপল					আয়তাকার চিত্র
	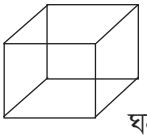 ঘনক					বর্গাকার চিত্র

		তলের সংখ্যা	তলের প্রকৃত (সমতল/বক্রতল)	ধারের সংখ্যা	শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা	তলের ধরন (ছবি আঁকি)
	গোলক	১টি		নেই	নেই	আঁকা যাবে না
	নিরেট অর্ধগোলক	২টি	১টি সমতল ১টি বক্রতল	১টি বক্ররেখা	নেই	সমতলটি বৃত্তাকার চিত্র
	শঙ্কু	২টি	১টি ১টি		১টি	সমতলটি বৃত্তাকার চিত্র
	নিরেট চোঙ		১টি 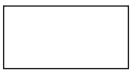 ২টি		নেই	সমতলটি বৃত্তাকার চিত্র

ঐকিক নিয়ম

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- দুটি রাশির মধ্যে সরল সম্পর্ক বা ব্যস্ত সম্পর্কের ধারণা প্রকাশ করতে পারবে
- সরল সম্পর্ক বা ব্যস্ত সম্পর্কের সাহায্যে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

সমস্যা বুঝে সমাধান করি ঃ

১০টি পেনের দাম ৫০ টাকা হলে ১টি পেনের দাম কত হবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি–

পেনের সংখ্যা	দাম
১০টি	৫০ টাকা
১টি	? টাকা

১টি পেনের দাম ৫০ টাকা থেকে কম হবে।

১টি পেনের দাম = ৫০ টাকা ÷ ১০ = ☐ টাকা

বুঝি যে পেনের সংখ্যা কমলে দামও ☐ (কমবে / বাড়বে)।

১টি পেনের দাম ৫ টাকা হলে ১২টি পেনের দাম কত হবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি–

পেনের সংখ্যা	দাম
১টি	৫ টাকা
১২টি	? টাকা

১২টি পেনের দাম ৫ টাকা থেকে বেশি হবে।

১২টি পেনের দাম = ৫ টাকা × ১২ = ☐ টাকা

বুঝি যে পেনের সংখ্যা বাড়লে দামও ☐ (কমবে / বাড়বে)।

বুঝি যে জিনিসের পরিমাণ কমলে দামও কমে, পরিমাণ বাড়লে দামও বাড়ে। তাই পরিমাণের সাথে দাম [সরল সম্পর্ক] ।

৮টি খাতার দাম ৯৬ টাকা হলে ৬টি খাতার দাম কত হবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি–

খাতার সংখ্যা	দাম
৮টি	৯৬ টাকা
৬টি	? টাকা

৬টি খাতার দাম ৯৬ টাকা থেকে কম হবে। (দাম কমবে)

১টি খাতার দাম = ৯৬ টাকা ÷ ৮ = ১২ টাকা

(দাম বাড়বে)

৬টি খাতার দাম = ☐ টাকা × ৬ = ☐ টাকা

৫ জনে ১৫টি মালা গাঁথলে ৯ জনে কয়টি মালা গাঁথবে দেখি।

জন	মালা
☐	১৫ টি
☐	? টি

৫ জন মালা গাঁথে = ☐ টি

১ জন মালা গাঁথবে = ☐ ☐ ☐ = ☐ টি (কম গাঁথবে)

৯ জন মালা গাঁথবে = ☐ ☐ ☐ = ☐ টি (বেশি গাঁথবে)

একটি দেওয়াল রং করতে ৩ জন ছেলের ২ দিন সময় লাগে, একই কাজ করতে ১ জন ছেলের কদিন লাগবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি-

ছেলের সংখ্যা	সময়
৩ জন	২ দিন
☐ জন	? দিন

১ জনের সময় লাগবে আরও বেশি দিন।

১ জনের সময় লাগে = ৩ দিন × ২ = ☐ দিন

বুঝি যে ছেলের সংখ্যা কমলে কাজের সময় ☐ (কমবে / বাড়বে)।

একটি দেওয়াল রং করতে ১ জন ছেলের ৬ দিন সময় লাগে, একই কাজ করতে ২ জন ছেলের কদিন লাগবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি-

ছেলের সংখ্যা	সময়
☐ জন	☐ দিন
২ জন	? দিন

২ জনের সময় লাগবে আরও কম দিন।

২ জনের সময় লাগে = ৬ দিন ÷ ২ = ☐ দিন

বুঝি যে ছেলের সংখ্যা বাড়লে কাজের সময় ☐ (কমবে / বাড়বে)।

বুঝি যে একই কাজ করতে কম লোকের বেশি দিন এবং বেশি লোকের কম দিন সময় লাগবে।

তাই লোক সংখ্যার সঙ্গে কাজের দিনসংখ্যা বিপরীত সম্পর্কে রয়েছে।

যে পরিমাণ খাবার ৫ জন লোকের ১২ দিন চলে, সেই পরিমাণ খাবার ৪ জন লোকের কতদিন চলবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি-

লোকসংখ্যা	সময়
৫ জন	☐ দিন
৪ জন	? দিন

৫ জন লোকের চলে = ১২ দিন

১ জন লোকের চলবে = ☐ দিন × ☐ = ☐ দিন (বেশি চলবে)

৪ জন লোকের চলবে = ☐ দিন ÷ ৪ = ☐ দিন (কম চলবে)

১২ জন লোক ৪ দিনে সেচের খাল পরিষ্কার করতে পারলে ১৬ জন লোক কতদিনে সেচের খাল পরিষ্কার করতে পারবে দেখি।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করি-

লোকসংখ্যা	সময়
☐ জন	☐ দিন
☐ জন	? দিন

☐ জন পরিষ্কার করে = ☐ দিন

১ জন পরিষ্কার করবে = (☐ ☐ ☐) দিন = ☐ দিনে

☐ জন পরিষ্কার করবে = (☐ ☐ ☐) দিন = ☐ দিনে

ত্রিভুজ

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- ত্রিভুজাকার চিত্র আঁকতে পারবে।
- বাহুভেদে ও কোণভেদে বিভিন্ন ত্রিভুজাকার চিত্র আঁকতে শিখবে।
- বিভিন্ন প্রকার ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যগুলি যাচাই করে সাধারণ সূত্র তৈরি করতে পারবে।

ত্রিভুজ নিয়ে নতুন কথা জানি

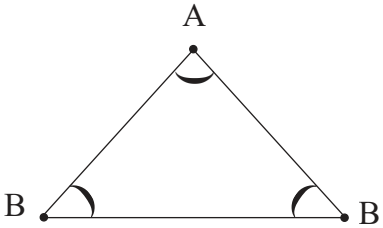

এটির তিনটি ধার তাই এটি ত্রিভুজাকার চিত্র বা ত্রিভুজ।

ত্রিভুজের ☐ টি ধার বা বাহু। ৩টি শীর্ষবিন্দু। আর চিত্রের ভিতরে ৩টি কোণ আছে।

ছবিতে, ত্রিভুজের বাহুগুলি হলো AB, ☐ , ☐ ।

শীর্ষবিন্দুগুলি হলো A, ☐ ও ☐ ।

কোণগুলি হলো <BAC, <ABC ও <ACB।

বিভিন্ন প্রকারের ত্রিভুজ

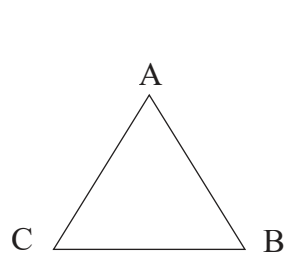

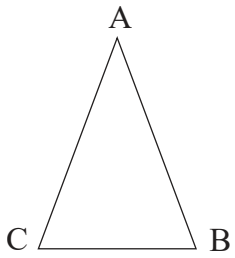

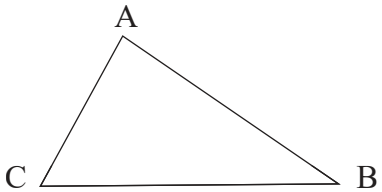

এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর সমান।
একে সমবাহু ত্রিভুজ বলে।
ছবিতে AB = BC = CA।

এই ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পর সমান। একে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে।
ছবিতে AB = AC ।

এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর অসমান। একে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলে।
ছবিতে AB ≠ BC ≠ CA।

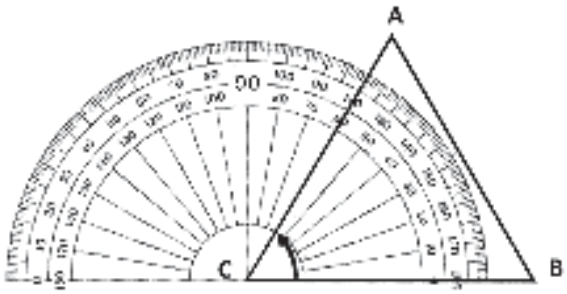

সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণ চাঁদা দিয়ে মেপে দেখি—

<ACB = ৬০°

<ABC = ৬০°

<BAC = ৬০°

এগুলি সূক্ষ্মকোণ।

ত্রিভুজের ৩টি কোণের যোগফল = ☐

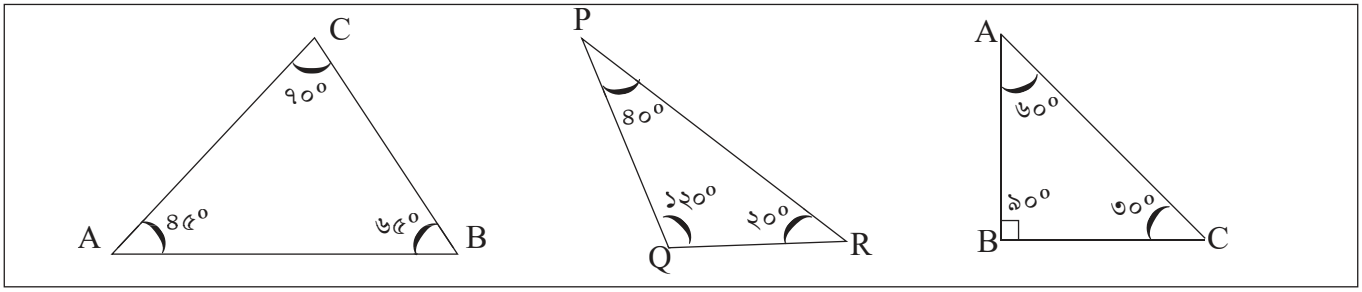

এই ত্রিভুজের তিনটি কোণের মান ৯০° এর থেকে কম। এরা সবকটি সূক্ষ্মকোণ। একে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলে।

ছবিতে ∠ACB = ☐

∠ABC = ☐

∠BAC = ☐

ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল = ☐

এই ত্রিভুজের তিনটি কোণের মধ্যে একটি কোণ ৯০° এর থেকে বড়ো। এটি স্থূলকোণ আর বাকি দুটি কোণ সূক্ষ্মকোণ। একে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।

ছবিতে ∠PQR = ☐

∠QPR = ☐

∠PRQ = ☐

ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল = ☐

এই ত্রিভুজের তিনটি কোণের মধ্যে একটি কোণ ৯০°। এটি সমকোণ আর বাকি দুটি কোণ সূক্ষ্মকোণ। একে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।

ছবিতে ∠ACB = ☐

∠ABC = ☐

∠BAC = ☐

ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল = ☐

খুঁজে পাই যেকোন ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল = ১৮০°

ত্রিভুজের কোণের মান খুঁজি :

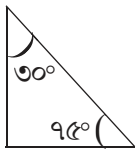	তিনটি কোণের যোগফল = ১৮০° দুটি কোণের যোগফল = ৩০°+৭৫°= ১০৫° তৃতীয় কোণটি = ১৮০°–১০৫°= ৭৫°
	তিনটি কোণের যোগফল = ☐ দুটি কোণের যোগফল = ☐ + ☐ = ☐ তৃতীয় কোণটি = ☐ – ☐ = ☐
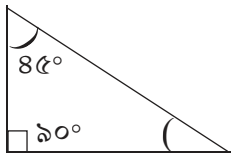	তিনটি কোণের যোগফল = ☐ দুটি কোণের যোগফল = ☐ + ☐ = ☐ তৃতীয় কোণটি = ☐ – ☐ = ☐
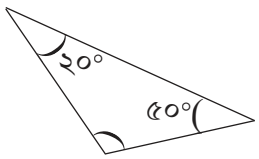	তিনটি কোণের যোগফল = ☐ দুটি কোণের যোগফল = ☐ + ☐ = ☐ তৃতীয় কোণটি = ☐ – ☐ = ☐

বৃত্ত

শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে —

- বৃত্তাকার চিত্র আঁকতে পারবে।
- বৃত্তের বিভিন্ন অংশগুলির নাম চিহ্নিত করতে পারবে।

বৃত্ত নিয়ে নতুন কথা জানি

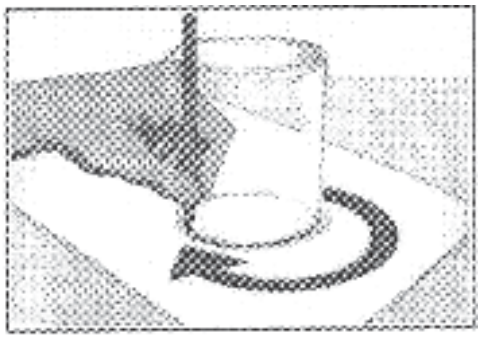

কৌটোর চারধারে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিলে পাই গোলাকার ছবি। একে বৃত্তাকার চিত্র বা বৃত্ত বলে।

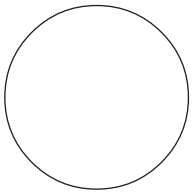

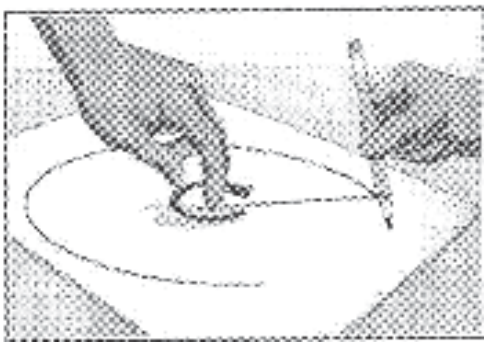

একটি সুতোর মাথায় পেন্সিল বেঁধে সুতোর অপর প্রান্তটা শক্ত করে কাগজে চেপে ধরে, সুতোটা টান করে কাগজের উপর পেন্সিল ঘোরালো বৃত্ত পাওয়া যায়।

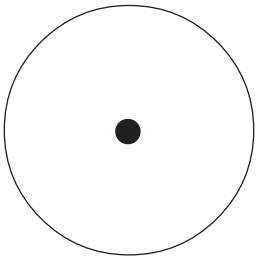

কাগজে সুতোটা যেখানে চেপে ধরা হয়েছে সেটা বৃত্তের কেন্দ্র।

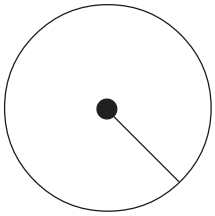

বৃত্তটি বক্ররেখা, এর দৈর্ঘের পরিমাপ বৃত্তের পরিধি।

বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বৃত্ত পর্যন্ত দূরত্বকে বৃত্তের ব্যসার্ধ বলে।

আরও নিখুত ভাবে বৃত্ত আঁকার জন্য পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করি। এখন ৫ সেমি. ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকতে হবে।

কাগজে স্কেল দিয়ে ৫ সেমি. সরলরেখাংশ এঁকে নাম দিলাম।

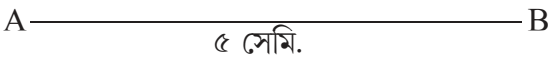

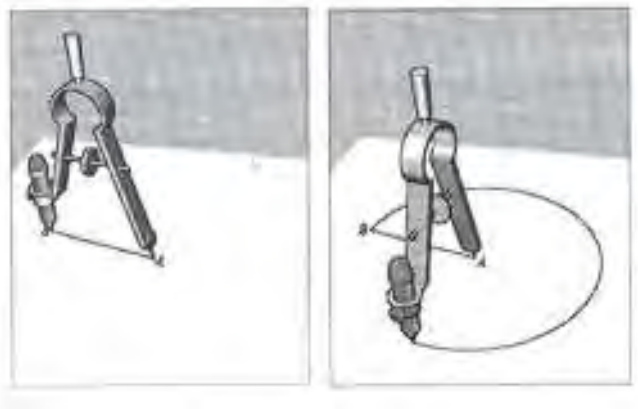

এখন A তে কম্পাসের কাঁটা বসিয়ে B তে পেন্সিল রেখে, A কে কেন্দ্র করে পেন্সিল ঘোরালে ৫ সেমি. ব্যাসার্ধের বৃত্ত পাই। তাহলে বুঝি বৃত্ত আঁকতে গেলে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ দরকার।

বৃত্ত থেকে কী কী পাই খুঁজে দেখিঃ

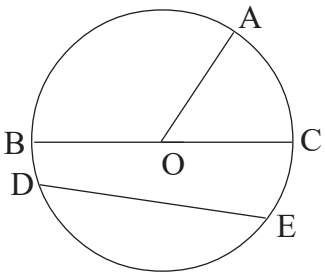

O বৃত্তের ☐। $\overline{OA} = \overline{OC} = \overline{OB}$ = বৃত্তের ☐।

বৃত্তের উপর যে কোন দুটি বিন্দু যোগ করলে যে সরলরেখাংশ পাওয়া যায় সেটি বৃত্তের জ্যা। DE একটি জ্যা।

$\overline{BC}$ বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা-কে বৃত্তের ব্যাস বলে।

AC বৃত্তের অংশ, একে বৃত্তচাপ বলে (ইহাকে লেখা হয় $\overset{\frown}{AC}$) ।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিই—

ক) বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য = ২ × ☐ দৈর্ঘ্য।

খ) বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা বৃত্তের ☐।

গ) বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা বৃত্তের ☐।

ঘ) বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বৃত্ত পর্যন্ত দূরত্ব বৃত্তের ☐ দৈর্ঘ্য।

শেখার সেতু

আমাদের পরিবেশ

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
কলকাতা - ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা ● সম্পাদনা ● তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক   পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী   রাতুল গুহ

বিষয় নির্মাণ, সম্পাদনা ও বিন্যাস

î ®ö˜ #œ ö‡ y¡ ì   ড. ধীমান বসু   অনিন্দিতা দে   মহঃ মাসুদ আখতার

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	মানবদেহ	1
2.	ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)	6
	নমুনা প্রশ্নপত্র ১	18
3.	পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি	19
4.	পরিবেশ ও সম্পদ	28
5.	পরিবেশ ও উৎপাদন (কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন)	33
	নমুনা প্রশ্নপত্র ২	38

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 মানবদেহ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- চামড়া বা ত্বকের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন মানুষের গায়ের রঙে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মানুষের চুল সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা আলোচনা করতে পারবে।
- শরীরের কাঠামো গঠনে হাড়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন কাজে অস্থিসন্ধির ভূমিকা আলোচনা করতে পারবে।
- পেশির কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
- হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শরীরের বর্ম — চামড়া

বর্ম কী জানো? আগেকার দিনে সৈন্যরা যুদ্ধে যেত বর্ম পরে। বর্ম শত্রুদের অস্ত্রের আঘাত থেকে সৈন্যদের শরীরকে রক্ষা করত। একইভাবে আমাদের সারা শরীর ঢেকে রেখেছে চামড়া বা ত্বক। চামড়াও শরীরকে বাইরের আঘাত ও সূর্যের আলোর অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায়। চামড়া বা ত্বকের নীচেই আছে শরীরের সবকিছু — মাংসপেশি, নার্ভ, শিরা, ধমনি। চামড়া বা ত্বক এদের রক্ষা করে। নইলে সামান্য আঘাতেই রক্ত পড়ত।

পাশের ছবিতে দেখো চামড়ার নীচে কেমন নলের মতো দেখা যাচ্ছে। নলগুলোর আবার শাখাও রয়েছে। ওই নলগুলো হল শিরা। ধমনি আর একটু ভেতর দিকে থাকে।

আমাদের শরীরের কোনো জায়গার চামড়া টান টান। কোথাও বা কোঁচকানো। চামড়া কোথাও পুরু আবার কোথাও বা পাতলা। হাতের চেটোর চামড়া পুরু বলে সেখানে শিরা দেখা যায় না। পায়ের তলার চামড়া আবার আরো পুরু। হাঁটার সময় গোড়ালিতে শরীরের সব ভার পড়ে। ঘষাঘষিও গোড়ালিতে বেশি হয়। তাই গোড়ালির কাছটা সবচেয়ে পুরু।

গায়ের রঙের রহস্য

তোমাদের কারোর কারোর হয়তো গায়ের রং কালো বলে মন খারাপ হয়। কিন্তু জানো কি, যাদের গায়ের রঙ কালো তাদের চামড়ার ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কম! এবার তাহলে এসো জেনে নেওয়া যাক চামড়ার রং কালো কেন হয়। চামড়ায় মেলানিন নামের একটা রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর জন্যই চামড়ার রং কালো হয়। চামড়ায় মেলানিনের পরিমাণে পার্থক্যের জন্য গায়ের রং ফর্সা বা কালো হয়।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যান্সার ঘটায়। চামড়ার মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ক্যানসার আটকায়। তাই বলে কি কালো চামড়ার মানুষদের ত্বকের ক্যানসার হয় না? হয়। কিন্তু কালো চামড়ার মানুষদের ত্বকের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা সাদা চামড়ার মানুষদের চেয়ে কম।

জেনে রাখো : ত্বকে রোদ লাগালে ভিটামিন ডি তৈরি হয়।

চুলের কথা

তোমরা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াও। চুল আঁচড়ানোর সময় দেখতে পাও যে চিরুনিতে কিছু চুল উঠে এলো। চুলের গোড়াগুলো মাথার কোথায় আটকে থাকে বলোতো? চামড়ার ওপরের স্তরে? নাকি ভেতরের স্তরে?

অনেক প্রাণীর গায়ে লোম বেশি। পাখির গায়ে পালক থাকে। মাছের গায়ে আঁশ থাকে। সাপেরও তাই। আবার ব্যাঙের গায়ে আঁশ, পালক বা লোম কিছুই নেই।

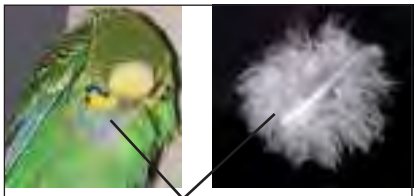

পাখির গায়ের খুব ছোটো পালক

মুরগি আর অন্যান্য পাখির গায়ের কিছু পালক খুব ছোটো। লোমেরই মতো। ওগুলোর গোড়াগুলো চামড়ার ভেতরের স্তরে আটকানো থাকে।

লোম, চুল, পালক সবেরই গোড়া থাকে চামড়ার ভেতরের স্তরে। চামড়া তো শরীরকে বাঁচায়। আবার চামড়াকেও প্রথম ধাক্কা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই লোম, চুল, পালক, আঁশ তৈরি হয়েছে।

হাড়, হাড়ের জোড় আর পেশির কথা

এতক্ষণ তো চামড়া, চামড়ার রং আর চুল সম্বন্ধে জানলে। এসো এবারে আমাদের শরীরের কাঠামো যারা তৈরি করে, সেই হাড় সম্বন্ধে জানা যাক।

জন্মের পর একজন শিশুর শরীরে প্রায় 300টির মতো হাড় বা হাড়ের অংশ থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকগুলোই একসঙ্গে জুড়ে যায়। অবশেষে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা হয় 206টি।

মানুষের হাড়গুলো নানা মাপের। কাঁধ থেকে কনুই অবধি কোনো ভাঁজ নেই। এই অংশে একটাই হাড় আছে। কোমর থেকে হাঁটু অবধিও একটাই লম্বা হাড় থাকে। অথচ আঙুলের ডগার হাড় খুবই ছোটো। কনুই থেকে কবজি অবধি আবার দুটো হাড় আছে। পাশের ছবি থেকে হাড়গুলোর নাম জেনে নাও।

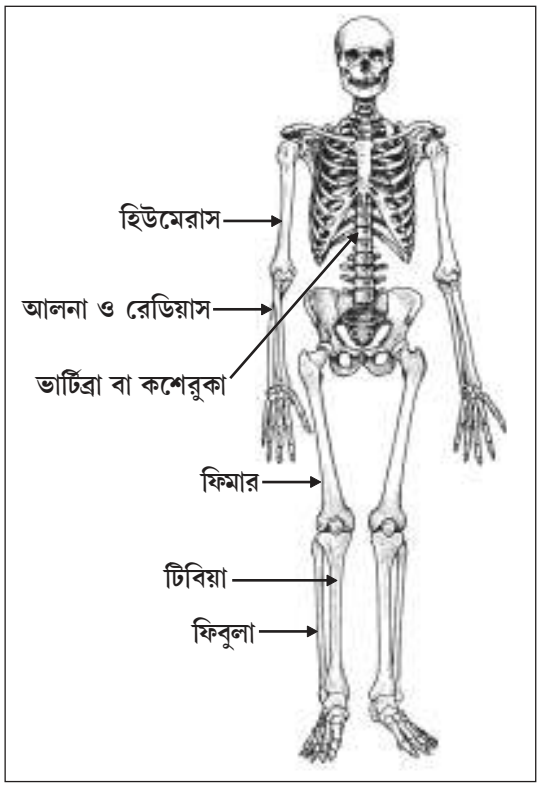

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট আকৃতি দেখা যায়। হাড়ের জন্যই তা সম্ভব হয়।

তোমাকে হাত দিয়ে একটা পাইপ ধরতে বলা হলো। লক্ষ করে দেখো পাইপ ধরতে গিয়ে হাতের আঙুলে কয়েকটা ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। যেখানেই আঙুল ভাঁজ হচ্ছে, সেখানেই আছে হাড়ের জোড় বা অস্থিসন্ধি। হাড় হলো অস্থি আর জোড় হলো সন্ধি।

জোড়গুলো না থাকলে হাঁটাচলা করা বা হাত মুঠো করা যেত না। কনুই থেকে হাত ভাঁজ করাও যেত না। এছাড়া অন্যান্য অনেক কাজও করা যেত না।

অস্থিসন্ধিতে হাড়গুলো দড়ির মতো একরকম জিনিস দিয়ে লাগানো থাকে। তার নাম লিগামেন্ট। কাঁধ, কোমর, হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধির মাঝখানে একরকম হড়হড়ে তরল থাকে। সেটা কমে গেলে হাড়ের নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

ব্যায়ামবীরের ছবি দেখেছ? দেখো কেমন পেশি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পেশি এমনিতে নরম। টানটান করলেই শক্ত হয়ে যায়। কিছু টানতে গেলে পেশির জোর চাই। পেশির জন্যই তোমরা নড়াচড়া করতে পারো। বা কোনো অঙ্গ নাড়াতে পারো। আসলে কোনো কাজ করতে হাড়কে সাহায্য করে পেশি। লিখতে গেলে পেশির সাহায্য লাগে। খেলতে গেলেও পেশির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আবার পড়ার জন্যও চোখের পেশি সাহায্য করে।

জিভও একটা পেশি। জিভ খাবার চিবোনোর সময় মুখের ভেতর খাবার এদিক-ওদিক করতে সাহায্য করে। জিভ আবার কথা বলতেও সাহায্য করে।

হৃৎপিণ্ড

ডাক্তারবাবুরা একটা নলের মতো যন্ত্র দিয়ে রোগীর বুক-পিঠ পরীক্ষা করেন। ওই যন্ত্রটা হলো স্টেথোস্কোপ।

এসো হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার যন্ত্র বানানো যাক—

- একটা প্লাস্টিকের ফানেল আর একটা পিচবোর্ড বা মোটা রবারের নল নাও।

- পিচবোর্ড বা মোটা রবারের নলটা এমন হতে হবে যা ওই ফানেলটার নলে লাগানো যাবে।
- ফানেলটার সঙ্গে রবারের নলটা আটকে দাও।

তৈরি হয়ে গেল কাজ চালানোর মতো একটা স্টেথোস্কোপ। পাশের ছবিটা দেখো।

এবার তোমার ছোটোবোনের বুকে নলটা ঠেকিয়ে ফানেলে কান দাও। দেখবে বুকে ধুকপুক শব্দ হচ্ছে। এবার তোমার বোনকে একটু দৌড়ে আসতে বলো। এখন আবার বোনের বুকে নলটা ঠেকালে দেখবে ধুকপুক শব্দটা বেড়ে গেছে।

এই স্টেথোস্কোপের সাহায্যে শরীরের ভেতরের নানা শব্দ (যেমন— হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের শব্দ) শুনতে পাওয়া যায়।

এই ধুকপুক শব্দটা আসছে হৃৎপিণ্ড থেকে। হৃৎপিণ্ড আসলে একটা পাম্পের মতো যন্ত্র যা সারা শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার জন্য ছড়িয়ে আছে ধমনি। কিন্তু সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার প্রয়োজন কী বলোতো? রক্ত সারা শরীরে অক্সিজেন আর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থ পৌঁছে দেয়।

হৃৎপিন্ড

স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার

ফ্রান্সে 1816 খ্রীস্টাব্দে রেনে লিনেক (Rene Laennec) স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

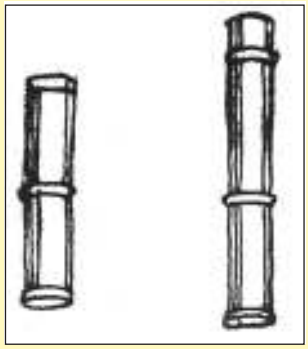

লিনেকের বানানো স্টেথোস্কোপ

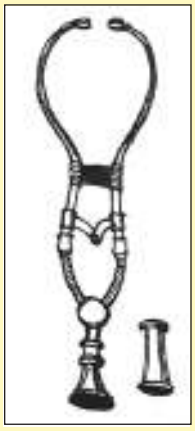

প্রথম দু-নলা স্টেথোস্কোপ

আজকের স্টেথোস্কোপ

মনে রাখা জরুরি :

- চামড়া বা ত্বক শরীরের ভেতরের অংশকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- চামড়ার মেলানিন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ক্যানসার আটকায়।
- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে 206 টি হাড় থাকে।
- বিভিন্ন কাজ করতে হাড়ের জোড় বা অস্থিসন্ধি সাহায্য করে।
- কোনো কাজ করতে হাড়কে সাহায্য করে পেশি।
- রক্ত সারা শরীরে অক্সিজেন আর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থ পৌঁছে দেয়।

তোমরা এই বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণির 'মানবদেহ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

মানুষের শরীরে কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত যে হাড়টি রয়েছে তার নাম হলো — ক) ফিমার খ) আলনা ও রেডিয়াস গ) কশেরুকা ঘ) হিউমেরাস।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

হাড়গুলি অস্থিসন্ধিতে যে দড়ির মতো জিনিস দিয়ে লাগানো থাকে তাকে _____ বলে।

৩. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

৩.১ শরীরের যেসব জায়গার চামড়া মোটা সেখানে শিরা দেখা যায়।

৩.২ ত্বকে রোদ লাগলে ভিটামিন ডি তৈরি হয়।

৪. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ ত্বকের কাজ কী?

৪.২ স্টেথোস্কোপ যন্ত্রটির আবিষ্কারক কে?

৪.৩ স্টেথোস্কোপের কাজ কী?

৫. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৫.১ মানুষের শরীরে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত যে দুটো হাড় থাকে তাদের নাম লেখো।

৫.২ জিভের কাজ কী কী?

2 ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বিভিন্ন ধরনের মাটির (যেমন—এঁটেল, বেলে, দোঁয়াশ) বৈশিষ্ট্য বুঝতে সহজ পরীক্ষা করতে পারবে।
- মাটির উর্বরতা বুঝতে ও কীসে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় তা উল্লেখ করতে পারবে।
- কোন কোন ধরনের মাটিতে ধান চাষ সবচেয়ে ভালো হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।
- জল পরিশোধনের বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করতে পারবে।
- ভৌমজল ও বৃষ্টির জলের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- জলাভূমির গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবে।
- মেরুদণ্ডের উপস্থিতি/অনুপস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাণীদের শ্রেণিভুক্ত করতে পারবে।
- কিছু প্রাণীর পোষ মানানো নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবে।

মাটির উপাদান

টিউবওয়েল বসাবার সময় মাটি আর জল বেরোয় পাইপ থেকে। মাটির নীচে সব জায়গায় মাটির প্রকৃতি একরকম নয়—কোথাও কাঁকর মাটি, কোথাও মিহি মাটি।

কী করে বোঝা যায় মাটিতে কী মিশে আছে?

যদি মাটি জলে গুলে নিয়ে থিতোতে দিই তাহলে ভারী জিনিস—কাঁকর, নুড়ি এসব নীচে থিতিয়ে পড়বে, খানিকটা হালকা কণা থিতোতে সময় লাগবে। খুব মিহি কণাগুলোর কিছুটা সহজে থিতোয় না। মাটিতে কিন্তু সবটাই বালি, মাটি আর কাঁকর নয়।

তাহলে মাটিতে আর কী থাকে?

মাটিতে কিছু জিনিস থাকে যেগুলো নানান জীবের থেকে এসেছে। জীব মানে কিন্তু উদ্ভিদ আর প্রাণী দুটোই বোঝায়। এই যেমন ধরো গোবর, মাছের কাঁটা, পাতার কুচি, ফুলের পাপড়ি, শামুকের খোলা ভাঙা, মরা কেন্নো এসব তো নানান প্রাণী আর উদ্ভিদ থেকেই এসেছে। এগুলোকে বলা যায় মাটির স্বাভাবিক উপাদান।

মাটিতে স্বাভাবিক উপাদান ছাড়াও আর কিছু আছে না কি?

হ্যাঁ, এই দেখোনা মানুষ কত কীই না ফেলে মাটিতে— প্লাস্টিকের কুচি, ওষুধের মোড়কের টুকরো, পেনের খালি রিফিল, নাইলনের দড়ির টুকরো। এসব কি প্রকৃতিতে এমনিই পাওয়া যায়? এসব তো মানুষের তৈরি আর মানুষের কাজের ফলেই মাটিতে মিশেছে। এগুলোই হলো মাটির অস্বাভাবিক উপাদান।

এসব ভালো করে দেখতে গেলে তোমাদের কী জোগাড় করতে হবে?

কী আর চাই, একটা ভালো আতশ কাচ হলেই চলবে। আতশ কাচ দিয়ে ছোটো ছোটো জিনিস বড়ো করে দেখা যায়।

নানান রকম মাটি

কোন মাটি কতটা জল ধরে রাখে তা বুঝতে একটা পরীক্ষা করো : তলায় অনেকগুলো ফুটো আছে এমন একটা কৌটোর নীচে ফিল্টার পেপার বিছিয়ে ওপরে গুঁড়ো মাটি রাখো। সেটাকে একটা গ্লাসের উপর বসিয়ে সেই মাটিতে জল ঢালো। যে মাটি জলকে যত ধরে রাখে তার বেলায় জল যেতে তত দেরি হবে।

এই এনেছি কৌটোটাকে, পরীক্ষাটা করব

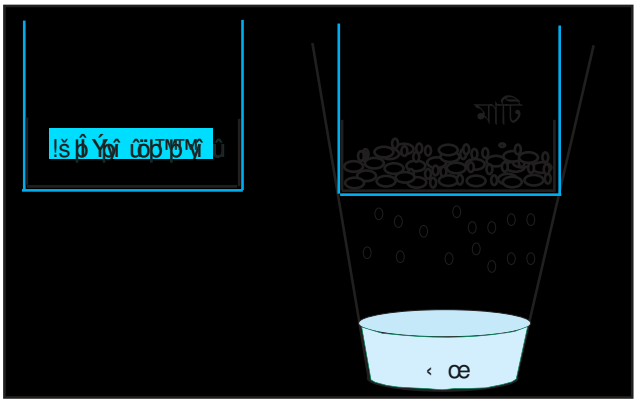

ফিল্টারেতে জল বেরোবে, গ্লাস পেতে তা ধরব

- এঁটেল মাটি হলে জল বেরিয়ে যেতে অনেক দেরি হয়। এঁটেল মাটি অনেক বেশি জল ধরে রাখতে পারে।
- দোঁয়াশ মাটি এঁটেল মাটির মতো অতটা জল ধরে রাখতে পারে না। তাই সেক্ষেত্রে জল খানিকটা তাড়াতাড়ি বেরোয়।
- বেলে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা সবচেয়ে কম। তাই ফিল্টার কাগজের ওপরে বেলে মাটি থাকলে জল সবচেয়ে আগে বেরিয়ে যাবে।

মাটির পুষ্টি বলতে কী বোঝায়

যে মাটিতে যত ভালো ফসল ফলে তাকে তত উর্বর মাটি বলা হয়।

মাটি কী করে উর্বর হয়?

মাটিতে নানান জীব আর নানান জীবাণু থাকে। নানান জীবের মধ্যে অন্যতম হলো কেঁচো। নানান জীব মিলে মাটির নানান মৃত জৈব উপাদানকে ভেঙে সরল পদার্থে পরিণত করে। গাছ তার মূলের সাহায্যে এসব জিনিসের কিছু কিছু নিজের দেহে নিয়ে নেয়। তার ফলে গাছ বাড়তে পারে। তবেই তো আমরা বলি মাটি উর্বর।

কিন্তু কীভাবে এই উর্বরতা বাড়ানো যায়?

দুরকম সার দিয়ে মাটির উর্বর্তা বাড়ানো যায়। এক হলো অজৈব সার আর আরেক হলো কম্পোস্ট সার। অজৈব সারের মধ্যে আছে নাইট্রোজেন সার, ফসফেট সার এইসব। এইসব সারের মধ্যে অনেক উপাদান একসঙ্গে থাকে। এসব থেকে গাছ তার পুষ্টির জন্য দরকারী উপাদান শুষে নেয়। কম্পোস্ট সার হলো জৈব সার। মাটির নানান জীব আর জীবাণুরা তাকে ভেঙে ভেঙে সরল জিনিসে পরিণত করার পর গাছ সেসব থেকে পুষ্টি পায়।

আজকাল মানুষ যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছে, যেখানে সেখানে ফেলছে, তাতে মাটির ক্ষতি হয়। মাটিকে আলো-হাওয়া পেতে বাধা দেয় প্লাস্টিক, গাছের শিকড়কে মাটিতে ঢুকতেও বাধা দেয়।

মাটি ভালো রাখতে, কী কী হবে থাকতে?

মাটির পক্ষে, গাছের পুষ্টির পক্ষে যা যা ভালো তা আলোচনা করে লেখো।

ফসল ফলাতে মাটি চাই

ধান আমাদের সবচেয়ে বড়ো খাদ্যশস্য।

কেমন জমিতে চাষ হয় ধানের?

আমন ধান রোয়ার জন্য জমিতে একটু জল দাঁড়াতে হয়। ধানের ছোটো চারা বীজতলা থেকে তুলে বসানো হয়। তবে আউশ ধানের জন্য বীজতলা দরকার হয় না। রোয়ার আগে মাটিটা কাদা করতে হয়। টানা বৃষ্টি হলে নীচু জমিতে জল দাঁড়ায়। তখন বীজতলা থেকে বীজধান তুলে নিয়ে ক্ষেতে বুয়ে দেয়।

কিন্তু বীজধান মানে কী?

প্রথমে ছোটো জায়গায় ধান ছড়াতে হয়। এটা বীজতলা। ঘন হয়ে ছোটো ছোটো চারাগাছ বের হয়। সেই গাছগুলোকে বলে বীজধান। হাতখানেক হলে সেগুলো তুলে বসাতে হয়। বিঘতখানেক অন্তর সারি দিয়ে বসায়। সেই চারা বসানোকে বলে রোয়া। তাই যে মাটি সহজে কাদা করা যায় তাতেই সহজে জল জমে। সেখানেই ধান রোয়া যায়। সেই মাটিই ধান চাষের জন্য ভালো। ধান চাষে এক দেড় ফুট গভীর মাটি লাগে।

ভরবে এ ক্ষেত সোনার ধানে

তুলছি পাতা চা বাগানে

শুধু ধান নয়, সব খাদ্যের জন্যই মাটি দরকার। তাই কি? মাছ, মাংস, ডিম তৈরি করতেও? হ্যাঁ, দরকার। কারণ, মাটি ছাড়া গাছ হবে না। গাছ অথবা শস্য খেলে তবেই তো প্রাণীদের মাংস হবে! পুকুরও তো মাটির উপরেই। তাই, মাটি ছাড়া মাছও হবে না। সকালবেলার চা থেকে সব খাবার পেতেই মাটি চাই।

পাথর থেকে মাটি তৈরি হয় কী করে?

ভূমিকম্পে, সূর্যের তাপে, প্রবল বৃষ্টিতে পাথর ফেটে গুঁড়ো হয়। অনেক বছর ধরে অনেক কিছুর সঙ্গে তা মিশে মাটি হয়। মস, ফার্নরাও মাটি তৈরিতে সাহায্য করে। এভাবে মাটি তৈরি হতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। সেই মাটির কিছুটা পাথরের ফাটল দিয়ে ভিতরে চলে যায়। আবার কিছুটা বৃষ্টিতে ধুয়ে সমতলে এসে থিতোয়।

জলাশয়ের কথা

জলাশয়গুলো নানান প্রাণীর বাসস্থান আর অনেক মানুষের খাদ্য ও জীবিকার সংস্থান করে। জলাশয়ে থাকে মাছ, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ, কচ্ছপ আরও কত রকমের জীব। সেখানে মাছ খেতে আসে চিল, বক আর মাছরাঙা পাখি আর নানা রকমের সাপ। জলাশয়ের ধারে জন্মায় কত রকমের গাছ। জলাশয়ের আশেপাশে ঘোরে বেজি, মেছোবিড়াল, ইঁদুর।

আজকাল অনেকেই জলাশয়ের পাড় বাঁধিয়ে দেয়, তাতে কচ্ছপ আর ব্যাঙের মতো প্রাণীদের বিপদ হতে পারে। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি সমস্ত প্রাকৃতিক জলাশয়ের যত্ন নিতে হবে, নয়তো সেখানকার প্রাণীরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে।

নানান রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোনো পদার্থ অন্য রকমের পদার্থে বদলে যায়। তোমরা চারপাশে কত রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে দেখেছ—লোহায় মরচে ধরা, কাগজ পুড়ে যাওয়া, কয়লা পোড়া আরও কত কী! **বদলে যায় কথাটার মানে কী?** বদলে যায় মানে হয়তো রং বদলে গেল, কিংবা গন্ধ বদলে গেল, কিংবা হয়তো কোনো নতুন জিনিস তৈরি হয়ে জলের নীচে থিতিয়ে পড়লো কি গ্যাস বেরোলো এই সব।

নীচের সারণিতে তোমাদের চেনা বেশ কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা বলা হলো। এর মধ্যে যেগুলো চেনো তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

রাসায়নিক বিক্রিয়া	নতুন কী কী ঘটতে দেখা যায়	দেখেছ কি?
লোহায় মরচে ধরা	লোহার ওপরে লালচে বাদামি ছাপ পড়তে থাকে	
কয়লা পোড়ানো	ধোঁয়া হয়, নানান রকমের গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোয়, আলো আর তাপ বেরোয়	
আপেলে ছোপ ধরা	আপেলের কাটা অংশে বাদামি ছোপ ধরে	
কাঁসার বাসনে ছোপ ধরা	হলুদ রঙের কাঁসার বাসনের জায়গায় জায়গায় সবুজ ছোপ পড়ে	
সরষের তেলে গন্ধ হয়ে যাওয়া	তেলে পুরোনো চিটে গন্ধ বেরোয়	
পোড়াচুনে জল দেওয়া	সাদা থকথকে কলিচুন থিতিয়ে পড়ে, তাপ বেরোয়	
চুনজলে সর পড়া	স্বচ্ছ চুনজল দু তিনদিন রেখে দিলে তার ওপরে সরের মত জিনিস তৈরি হয়	
লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটানো	দুধ থেকে ছানা আলাদা হয়ে যায়	

লোহায় মরচে ধরেছে

কাটা আপেলে বাদামি ছোপ ধরেছে

কয়লায় আগুন জ্বলছে

জলশোধনের কথা

জলাশয়ের জলে নানান জৈব পদার্থ এসে পড়ে। তার কিছুটা জীবাণুরা নষ্ট করে দেয়, আর কিছুটা বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে নষ্ট হয়। এই দুরকমের নষ্ট হওয়াই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া। শুধু জীবাণুরা নয়, জলে অন্যান্য ছোটো-বড়ো জীবেরাও থাকে। তারাও কিছু নোংরা খেয়ে ফেলে।

কিন্তু তাই বলে কি জলাশয়ে নোংরা ফেলা উচিত?

না, জলাশয়ের জলে গবাদি পশু স্নান করানো, মলমূত্র পরিত্যাগ করা, বাড়ির আবর্জনা ফেলা, বাসন মাজা, প্লাস্টিক ফেলা একেবারেই বারণ। এসব করলে জলাশয়ের জলে দূষণ ঘটে মাছ এবং অন্যান্য জীব মরে যাবে।

মাছের কোনো কোনো অসুখে জলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া হয়। তা যেমন মাছের অসুখ সারাতে পারে, তেমনি কিছু দূষিত পদার্থকে নষ্ট করে জলশোধনও করে। তবে তার পরিমাণ ঠিকঠাক হওয়া চাই, নয়তো অন্য জীব আর মাছ মরে যাবে।

জলাশয়ে কী কী জিনিস মিশে কী ক্ষতি করতে পারে :

জলাশয়ে কী কী জিনিস মেশে	তার ফলে কী কী সমস্যা হয়
১. কলকারখানার তেল	তেল জলের ওপরে ভাসে, ফলে জলে অক্সিজেন ঢুকতে পারেনা। অনেক জীব মরে যায়।
২. মরা জন্তুর দেহ	জলে নানান জীবাণুর বৃদ্ধি হয়, জলে দুর্গন্ধ হয়, অনেক জীব মরে যায়।
৩. পোকামারার বিষ	অনেক প্রাণী মরে যায়।
৪. রাসায়নিক সার	শ্যাওলা ও নানান জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে, জলে অক্সিজেন কমে যায়।

এইসব কারণে বিভিন্ন জায়গার নিকাশী জল যাতে জলাশয়ে এসে পড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মাটির নীচের জল

আগে মানুষ যে পুকুর থেকে পানীয় জল নিত তাতে কেউ স্নান করত না, নোংরাও ফেলত না। যেখানে মাটির নীচে সহজে জল পাওয়া যায় না অথবা মাটির নীচের জল খুব নোনতা সেখানে এখনও পুকুর আছে।

এখন টিউবওয়েল হয়েছে। লোকে চাষের জন্য ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে প্রচুর জল তুলে ফেলছে মাটির নীচ থেকে। এত জল তোলার ফলে মাটির নীচে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। এ থেকে আবার আগের মত জলের ভাণ্ডার তৈরি হওয়া মোটেই সহজ নয়। এর ফলে ভবিষ্যতে পানীয় জলের অভাব দেখা দেবে। পানীয় জল দূষিতও হবে।

রোজ হতো জল আনতে যেতে

জল তুলে দিই চাষের ক্ষেতে

সুন্দরবনের কাছে মাটির নীচের জল খুব নোনতা। মাটির নীচে বালির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের জল চুঁইয়ে এসেছে বলেই জল নোনতা হয়েছে।

জল নষ্ট আর জলকষ্ট

রাস্তার কলে জল নষ্ট হয় দেখলে কল বন্ধ করা উচিত। এই জলই অনেক মানুষের কাছে পানীয় জল, রান্নার জল তাই ওই জল নষ্ট করা উচিত নয়। পুকুরের জলে অনেকে আনাজপাতি ধুয়ে রান্না করেন। তবে পুকুরের জলে রান্নাবান্না করা উচিত নয়। যেসব খাবারে ব্যবহার করা জল ফুটবে না তা পুকুরের জলে করা উচিত নয়।

সারাদিন কত মানুষ জলের জন্যে লাইন দিয়ে জল নেন। তাঁদের কী করে চলবে?

টিউবওয়েলে জল ব্যবহারের সময়েও যতটা জল তোলা হয় তার বেশ খানিকটা নষ্ট হয়। এই অপচয় কমানো দরকার। নয়তো অল্পদিনের মধ্যেই সেই টিউবওয়েলে আর জল উঠবে না। **রাস্তার কল খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দিয়ে জল বাঁচাও।**

লম্বা লাইন জলের কলে

জল ওঠে এই টিউবওয়েলে

বৃষ্টির জল ধরা আর জল নষ্টের হিসেবনিকেশ

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারলে তা দিয়ে বেশ কিছু কাজ করা যায়। টিনের চাল থেকে জল পড়ে, জল পড়ে ছাদের পাইপ দিয়েও। এই জল বালতি করে ধরে রাখলে তা দিয়ে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যায়, বাড়ির উঠোন ধোয়া যায়। বৃষ্টির জল পরিষ্কার হলে তাতে জামাকাপড় কাচা যেতে পারে। তবে রান্নার বা পানের জন্য এই জল ব্যবহার করা উচিত নয় কখনোই। আজকাল অনেক জায়গায় বহুতল বাড়িতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। তা দিয়ে উঠোন ধোয়া গাড়ি ধোওয়া এসব কাজ করা যায়। বৃষ্টির জল কাজে লাগালে মাটির নীচের জলের অনেকটা বাঁচানো যাবে। জল নষ্ট করলে একদিন পানীয় জলও পাওয়া যাবে না।

বৃষ্টির জল রাখব ধরে

জল বাঁচাব মাটির স্তরে

কম গভীরের জল

অনেক গ্রামে একটা দুটোর বেশি টিউবওয়েল নেই। সেখানের মানুষ জলের জন্য ওই টিউবওয়েল আর কুয়োর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। অনেকে অগভীর টিউবওয়েলের জল পান করতে বাধ্য হন। অগভীর টিউবওয়েলের জল পান করা উচিত নয়। ওই জলে মাটির ওপর থেকে জল চুঁইয়ে মিশতে পারে। তার ফলে সেই জল সবসময় পানের যোগ্য থাকে না।

নীচের সারণিটি সম্পূর্ণ করো।

জলের প্রকৃতি	কীভাবে ব্যবহার করা হয় বা কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে	কীভাবে অপচয় হয়	কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়
ভৌমজল			
বৃষ্টির জল			

জলাভূমির কথা

একটা বড়ো জলাভূমিতে কী কী প্রাণী থাকে জানো? কোথা থেকে আসে তার জল? মানুষের কী কাজে লাগে জলাভূমি? কখনো ভেবেছ সেই নিয়ে? নীচে তোমাদের জন্য পুরোনো দিনের একটা জলাভূমির ছবি আঁকা হলো, দেখোতো কেমন লাগে।

প্রথমে আমরা দেখি জলাভূমি তৈরি হলো কী ভাবে। আজ যেটা জলা হয়তো অনেক আগে সে ছিল কোনো বিশাল কোনো দিঘি। এমনও হতে পারে যে ওটা কোনো একটা নিচু জায়গা যেখানে বর্ষার বৃষ্টির জল গিয়ে জমত। সেই থেকে ধীরে ধীরে জায়গাটা বদলে গেছে। এমনও হতে পারে সেই জলাভূমি দূর অতীতের কোনো নদীর অংশ। নদী আজ নেই, কিন্তু তার খানিকটা অংশ জলাভূমি হয়েই রয়ে গেছে। হয়তো জলাভূমির নীচের কোনো জায়গার সঙ্গে মাটির নীচের জলের যোগ আছে। তাই জল শুকোয় না। খুব বৃষ্টি হলে সেই জল মাটির নীচে চলে যায়। বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমিগুলোর বিভিন্ন নাম—কোথাও দহ, কোথাও মোনস, কোথাও চাউরস।

জলাভূমিতে অনেক গাছ দেখা যায়— পানা, শোলা, কলমি কত কী। জলের মাঝে আছে ঢেঁকি শাক, কচু গাছ। কই, পাঁকাল, মাগুর, শোল কতরকমের মাছ থাকে সেই জলে! আর থাকে চিংড়ি আর কাঁকড়া। কোনো কোনো জলাভূমিতে কচ্ছপও পাওয়া যায়। তবে কচ্ছপ ধরা বেআইনি। কোনো কোনো জলাভূমিতে আগে কুমিরও থাকত। নানান ছোটো-বড়ো মাছের জন্য কতরকম পাখি আসে সেখানে— বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, চিল। কোনো কোনো জলাভূমিতে শামুকখোল পাখিরা আসে শীতকালে। **'শীতকালে আসে' মানে কী বলো তো?**

দূর বিদেশে শীতকালে খুব ঠান্ডা পড়ে। তখন সেখান থেকে অনেক পাখি হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে উড়ে আসে আমাদের মত গরম দেশের জলাভূমিতে। সেই জলাভূমি তাদের খাদ্য আর থাকার জায়গা যোগায়। শীতের শেষে আবার পাখিরা উড়ে যায় তাদের নিজেদের দেশে।

জলার মাছের জন্য পাখি ছাড়াও নানান প্রাণী আসে— শেয়াল, বেজি, ভোঁদড়, সাপ, মেছোবিড়াল। জলাভূমিতে কচ্ছপও পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। কোথাও মানুষ জলাভূমির মাছ ধরে, বিক্রি করে। কচ্ছপ ধরা কিন্তু বেআইনি কাজ।

এই বই পড়ে এটা শিখে নাও আজ : কচ্ছপ ধরে আনা বেআইনি কাজ

এই যে এতরকমের প্রাণীকে খাদ্য আর আশ্রয় যোগায় যেসব জলাভূমি, সেসব বাঁচানো দরকার। জলাভূমি না থাকলে এসব প্রাণীরা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

ধরো কোনো একটা জলাভূমির জলে কলকারখানার নিকাশি জল পড়তে শুরু হলো।

নিকাশি জল কোনো জলাভূমিতে পড়লে সেখানকার প্রাণীদের কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে তা নীচের সারণিতে লেখো :

প্রাণী	কার কী সমস্যা হবে
মাছ	
কাঁকড়া	
চিংড়ি	
বক	
সাপ	
বেজি	
ভোঁদড়	
শামুক	

উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়েই জীবজগৎ

উদ্ভিদের ওপরে প্রাণীরা কি নির্ভর করে? কী মনে হয়? তোমরা জানো যে সূর্যের আলোর সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জল থেকে একটা সবুজ গাছ তার দেহে খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদকে খায় তৃণভোজী প্রাণীরা— এই ধরো নানান ধরনের পোকা, গোরু, মোষ, ছাগল, হরিণ। এরা উদ্ভিদকে খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু ব্যাঙ বা সাপ কী খায়? আবার বাঘ কী খায়? এটা ভাবতে গেলে দেখবে ব্যাঙ যে পোকা খাচ্ছে সেই পোকা সরাসরি বা সরাসরি না হলেও খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। আবার সাপ খায় ইঁদুর আর ব্যাঙ, সে তো আর পোকা খায়না, ঘাসও খায়না। হরিণ হলো তৃণভোজী প্রাণী আর হরিণকে খায় বাঘ।

খাদ্যের অভাবে হরিণ মারা পড়লে তখন বাঘই বা বাঁচবে কী করে? কতদিন না খেয়ে বাঁচা যায়? তাহলে বোঝা গেল যে বাঘকে বাঁচতে গেলেও উদ্ভিদ চাই। আমরা যদি নিজেদের দিকে দেখি তাহলে দেখব যে আমরাও দুধ-মাংস-ডিম-মধুর জন্য কতরকমের প্রাণীরা উপর নির্ভর করি। তারাও তো সরাসরি বা সরাসরি না হলেও উদ্ভিদের উপর নির্ভর করেই বাঁচে। তাহলে বোঝা গেল যে মানুষের দরকার সবাইকে। সমস্ত জীবজগৎকে বাঁচাতে না পারলে মানুষেরও খুব অসুবিধা হবে।

উদ্ভিদ আর প্রাণীদের খাদ্য নিয়ে আলোচনা করে লেখো

গাছ কী কী দিয়ে খাদ্য তৈরি করে	তৃণভোজী পোকারা কী খায়?	ব্যাঙ কী খায়?	সাপ কী খায়?

জীবজগৎ

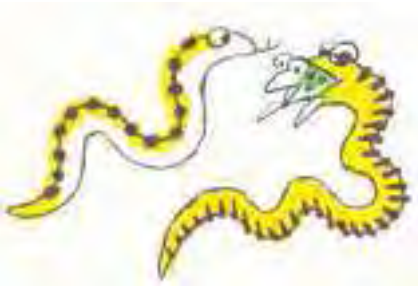

বুনো থেকে পোষা হলো

নিজের দরকারে নানান প্রাণীকে পোষ মানিয়েছে মানুষ। গোরু, মোষ, ঘোড়া, হাঁস, ভেড়া, ছাগল, মুরগি যা আজ আমরা দেখি সেইসব প্রাণীকে মানুষ অনেক দিন আগে পোষ মানিয়েছে। এই পশুপাখিদের পোষ মানাতে পারলে কত সুবিধে। কোনো প্রাণী দেয় দুধ, কোনো প্রাণী থেকে পাই মাংস, কোনো পাখি থেকে পাই মাংস আর ডিম। কোনো প্রাণী চাষের কাজে লাঙল টানে। এসো জেনে নিই কোন প্রাণীর কাছ থেকে মানুষ কী পায়।

নীচের সারণিতে তুমি আরো কিছু প্রাণীর নাম আর তার থেকে কী পাওয়া যায় তা লেখো:

পালিত প্রাণী	তার থেকে কী পাওয়া যায়
১. মোষ	দুধ
২. ছাগল	
৩. ভেড়া	মাংস, পশম
৫. হাঁস	
৬. টার্কি	মাংস
৭. মুরগি	
৮. মৌমাছি	

মানুষ পুষলেই কি কোনো প্রাণীকে পোষ মানানো বা গৃহপালিত বলা যায়? টিয়াপাখি পুষলেই কি সে গৃহপালিত? না তা কিন্তু নয়। পোষ মানানো প্রাণীরা ছেড়ে দিলে ফিরে আসে, টিয়া বা ময়না কিন্তু ফিরবে না। ঘরের কাছের নানান প্রাণী তারা বাড়িতে আসে, কিন্তু তারা আসলে বুনো। এই ধরো পিঁপড়ে, ভাম, গিরগিটি, মাকড়সা, ইঁদুর, ছুঁচো, সাপ, ব্যাং সবই বুনো প্রাণী।

মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডী

যেসব প্রাণীদের পিঠের দিকে শিরদাঁড়া আছে তারা হলো মেরুদণ্ডী প্রাণী। যাদের শিরদাঁড়া নেই তারা হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণী। আমরা যদিও চিংড়িমাছ বলি, চিংড়ি কিন্তু আসলে মাছ নয়। মাছেদের শরীরে শিরদাঁড়া থাকে। চিংড়ির তো তা নেই। চিংড়ি একরকমের অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

মেরুদণ্ডী প্রাণী

মাছ

ব্যাঙ

টিকটিকি

বাঘ

পাখি

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

কেন্নো

শামুক

চিংড়ি

কেঁচো

স্থানীয় প্রাণীর হারিয়ে যাওয়া

আমাদের আশেপাশের চেনা পরিবেশ থেকে একটু একটু করেই হারিয়ে যাচ্ছে নানান প্রাণী। আর কিছুদিন পরে অনেক মাছ আর দেখাই যাবে না। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? কোনো জলাশয়ে হয়তো কীটনাশক ধোয়া জল গিয়ে পড়ল, তখন সেইখানের মাছেরা মরে যেতে লাগল। কোথাও হয়তো কোনো প্রাণী খাদ্য আর বাসস্থানের অভাবে মরে যেতে লাগল। কীটনাশক দিয়ে মানুষ ফসলের ক্ষতিকারক পোনা মারতে থাকলে বন্ধু পোকারাও মরে যায়। কীটনাশক দেওয়ায় প্রজাপতি, মৌমাছির মত উপকারী পোকারাও মরে যায়। আগে নানারকমের গাছগাছালি ছিল চারপাশে। এখন চাষের জমি করার জন্য মানুষ বনজঙ্গল কেটে ফেলছে। সেইসঙ্গে সেইসব বনজঙ্গলে যেসব প্রাণী থাকত তারা হারিয়ে যাচ্ছে। থাকবে কোথায়? খাবে কী? শুধু তো মাছ নয়। আরও অনেক জীবজন্তুই কমে গেছে। শকুনরা মরা জন্তুর মাংস খেত। পরিবেশে দুর্গন্ধ হতো না। এখন গোরুদের ব্যথা কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়। তাই তাদের মাংসেও বিষ। শকুনরা সেই মাংস খেয়ে হারিয়ে যাওয়ার মুখে। মানুষের এমন কাজের ফলে শুধু কি প্রাণীরাই হারিয়ে যাচ্ছে? বনজঙ্গল কেটে ফেলায় নানান ঔষধি গাছ— সর্পগন্ধা, মেহেন্দি, মুক্তঝুরি তারাও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন চলতে থাকলে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য কমে যাবে। তাতে ক্ষতি আমাদেরই।

মনে রাখা জরুরি :

- পলিথিন, প্লাস্টিক মাটিকে আলো হাওয়া পেতে দেয় না। গাছের শিকড়গুলোকে মাটিতে ঢুকতে বাধা দেয়। তাই যেখানে সেখানে প্লাস্টিক ফেলা উচিত নয়।
- পুকুরে গবাদি পশু স্নান করালে, মলমূত্র ত্যাগ করলে, বাড়ির আবর্জনা, নিকাশী জল, প্লাস্টিক ইত্যাদি ফেললে পুকুরের জল দূষিত হয়।
- টিউবওয়েলের, কুয়োর বা কলের জল নষ্ট করা উচিত নয়। মাটির নীচের জলের বেহিসাবি খরচে আমাদেরই ক্ষতি।
- জলাভূমিগুলো বাঁচানো দরকার নইলে সেখানকার নানান প্রাণী আর উদ্ভিদ হারিয়ে যাবে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা খুব দরকারি কাজ।

তোমরা এই বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণির 'ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ মাটির একটি স্বাভাবিক উপাদান হলো — (ক) গাছের পাতা (খ) অ্যালুমিনিয়ামের কুচি (গ) পলিথিনের কুচি (ঘ) পেনের রিফিলের টুকরো।

১.২ শামুকখোল এক ধরনের — (ক) পাখি (খ) মাছ (গ) সাপ (ঘ) শামুক।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ _____ মাটির জলধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম।

২.২ চাষ করতে হলে বীজ আর জল ছাড়াও _____ চাই।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ এঁটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি।

৩.২ জৈবসার দিলে মাটি উর্বর হয় না।

৩.৩ পুকুরের জলে রান্না না করাই ভালো।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখো যা জলশোধনে সাহায্য করে।

৪.২ ''কোনো একটি জলাভূমির জল কিছুতেই শুকোয় না'' — এই বক্তব্য থেকে তুমি ঐ জলাভূমির সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

৫. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ পুকুরের জল পরিষ্কার রাখতে কী কী নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত?

৫.২ তোমার পরিচিত তিনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদাহরণ দাও।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ চামড়ার নীচে ফুলে থাকা নলের মতো অংশগুলো হলো— ক) ধমনি খ) শিরা গ) মাংসপেশি ঘ) নার্ভ।

১.২ সারা শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেয় যে পাম্পের মতো যন্ত্র সেটি হলো — ক) ফুসফুস খ) শিরা গ) ধমনি ঘ) হৃৎপিণ্ড।

১.৩ শামুকখোল এক ধরনের — (ক) পাখি (খ) মাছ (গ) সাপ (ঘ) শামুক।

১.৪ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো — (ক) কেঁচো (খ) কেন্নো (গ) টিকটিকি (ঘ) শামুক।

১.৫ একটি বন্য পশু হলো — (ক) হরিণ (খ) গোরু (গ) ছাগল (ঘ) মোষ।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার যন্ত্রটির নাম _____।

২.২ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা হলো _____।

২.৩ দোঁয়াশ মাটিতে _____ আর কাদার ভাগ প্রায় সমান সমান।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ ব্যাঙের গায়ে আঁশ থাকে।

৩.২ জিভ একটা পেশি।

৩.৩ এঁটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি।

৩.৪ চড়াই, কাক পাখিগুলি সহজেই পোষ মানে।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ মেলানিন আমাদের কী উপকার করে?

৪.২ মানুষের শরীরে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত যে হাড়টি রয়েছে তার নাম কী?

৪.৩ কম্পোস্ট কী জাতীয় সার?

৪.৪ জলে পাওয়া যায় এমন দুটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লেখো।

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ শরীরের চামড়াকে কেন বর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়?

৫.২ সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার প্রয়োজন কী?

৫.৩ মানুষ বিভিন্ন পশুদের পোষ মানায় কেন?

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ আমাদের শরীরে অস্থিসন্ধি না থাকলে কী সমস্যা হতো?

৬.২ পেশির কাজ কী?

৬.৩ পুকুরে কী কী জিনিস ফেললে পুকুরের জল দূষিত হয়?

৬.৪ মানুষ বিভিন্ন পশুদের পোষ মানায় কেন?

3 পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরূপ আলোচনা করতে পারবে।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবে।
- দক্ষিণবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবে।

আমরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। ভারতের পূর্বে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মোট জেলার সংখ্যা ২৩টি। আমাদের রাজ্যের উত্তরে আছে সুবিশাল পর্বত, পশ্চিমে আছে রুক্ষ লালমাটির অঞ্চল, এর পূর্বে রয়েছে সুজলা-সুফলা উর্বর সমভূমি, আর দক্ষিণে আছে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল। আরও দক্ষিণে গেলে আমরা পাবো বিরাট জলরাশির বঙ্গোপসাগর।

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটা (পৃষ্ঠা 20) লক্ষ করলে দেখবে রাজ্যের প্রায় মাঝখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে গেছে গঙ্গা নদী। এই নদীর উত্তরের অংশ **উত্তরবঙ্গ** আর দক্ষিণের অংশ হলো **দক্ষিণবঙ্গ**। এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি, নদী, মাটি এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেবো।

উত্তরবঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উত্তরবঙ্গের মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর আর মালদা জেলা (পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র পৃষ্ঠা 20)।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

দার্জিলিং আর কালিম্পং জেলায় আছে অনেক উঁচু উঁচু পর্বত। মূলত এই দুই জেলা ও আলিপুরদুয়ারের উত্তরের সামান্য অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল। এখানে ভূমির উচ্চতা যথেষ্ট বেশি। এই অঞ্চল সমুদ্র সমতল থেকে গড়ে ৯০০ থেকে ১০০০ মিটার উঁচু। এখানকার অধিকাংশ পর্বতের চূড়াগুলি বরফে ঢাকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ সান্দাকফু (৩৬৩০ মিটার) এই অঞ্চলে অবস্থিত।

> **জেনে রাখো**
>
> কোনো জায়গা বা অঞ্চল কতটা উঁচু তা মাপা হয় সমুদ্র সমতলের সাপেক্ষে।

সান্দাকফু

পর্বতের মাথায় বা চূড়ায় তাপমাত্রা খুব কম থাকায় তুষারপাত হয়, তুষার জমে বরফে পরিণত হয়। সূর্যের তাপে এই বরফ কিছুটা গলে গেলে জল হয়ে পর্বতের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসে। এরকম অনেকগুলি ছোটো বড়ো জলধারা মিলে তৈরি হয় বড়ো **নদী**। এই নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকায় এদের বলে **নিত্যবহ নদী**। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, সঙ্কোশ নিত্যবহ নদীর উদাহরণ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় আছে ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গল বিভিন্ন পশু-পাখির প্রাকৃতিক আবাস। যেমন— জলপাইগুড়ির জলদাপাড়া, গরুমারাতে আছে একশৃঙ্গ গন্ডার, হাতি, বাইসন, ভালুক প্রভৃতি। এছাড়া বক্সার ঘন জঙ্গলে আছে বাঘ, বাইসন, হাতি, ভালুক, নানারকম পাখি ও প্রজাপতি। গর্জন, চাপলাস, বাঁশ, শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি গাছের সমাবেশ ঘটেছে এই ঘন জঙ্গলে। এরপর তরাই অঞ্চল শুরু হবে। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তাই বলা যেতে পারে যে এই অংশের জমির ঢাল দক্ষিণমুখী।

মানচিত্র
পশ্চিমবঙ্গ
৮৬°০০´´ পূঃ
৮৭°০০´´ পূঃ
৮৮°০০´´ পূঃ
৮৯°০০´´ পূঃ
৯০°০০´´ পূঃ
২৭°০০´´ উঃ
২৬°০০´´ উঃ
২৫°০০´´ উঃ
২৪°০০´´ উঃ
২৩½°উঃ
২৩°০০´´ উঃ
২২°০০´´ উঃ
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্য সীমানা
জেলা সীমানা
রাজধানী
জেলা সদর
অন্যান্য শহর
জাতীয়/রাজ্য সড়ক
রেলপথ
নেপাল
সিকিম
ভুটান
ভারত
বিহার
ঝাড়খণ্ড
বাংলাদেশ
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর
গঙ্গা
কর্কটক্রান্তি রেখা
দার্জিলিং
কালিম্পং
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
উত্তর দিনাজপুর
দক্ষিণ দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
পশ্চিম বর্ধমান
পূর্ব বর্ধমান
নদিয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলি
উত্তর ২৪ পরগনা
কলকাতা
হাওড়া
পশ্চিম মেদিনীপুর
ঝাড়গ্রাম
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পূর্ব মেদিনীপুর
কার্শিয়াং
শিলিগুড়ি
খড়িবাড়ি
মাল
নাগরকাটা
জলঢাকা
মাদারিহাট
কালচিনি
কুমারগ্রাম
ময়নাগুড়ি
মেখলিগঞ্জ
দিনহাটা
তুফানগঞ্জ
সিতাই
চোপড়া
ইসলামপুর
চাকুলিয়া
হেমতাবাদ
রায়গঞ্জ
কালিয়াগঞ্জ
কুশমণ্ডি
বংশীহারি
কুমারগঞ্জ
বালুরঘাট
হরিশ্চন্দ্রপুর
রতুয়া
গাজোল
মানিকচক
ইংলিশ বাজার
হবিবপুর
কালিয়াচক
সুতি
মুরারাই
জঙ্গীপুর
সাগরদিঘি
রামপুরহাট
লালবাগ
বহরমপুর
কান্দি
করিমপুর
সিউড়ি
চিত্তরঞ্জন
দুবরাজপুর
লাভপুর
বোলপুর
ভরতপুর
কাটোয়া
নাকাশিপাড়া
আসানসোল
দুর্গাপুর
পারা
রঘুনাথপুর
শালতোড়া
ঝালদা
কাশীপুর
বাঘমুণ্ডি
মানবাজার
বলরামপুর
বাঁকুড়া
সোনামুখী
ইন্দাস
ইন্দপুর
বিষ্ণুপুর
খাতরা
সিমলাপাল
কোতুলপুর
রানীবাঁধ
বর্ধমান
কালনা
জামালপুর
কৃষ্ণনগর
শান্তিপুর
রানাঘাট
বনগাঁ
চুঁচুড়া
কল্যাণী
নৈহাটি
বারাসাত
তারকেশ্বর
আরামবাগ
চন্দ্রকোণা
খানাকুল
চণ্ডীতলা
ব্যারাকপুর
বসিরহাট
বান্দুয়ান
রায়পুর
বেলপাহাড়ি
শালবনী
ঘাটাল
আমতা
হাওড়া
আলিপুর
বিনপুর
মেদিনীপুর
উলুবেড়িয়া
বজবজ
ক্যানিং
সন্দেশখালি
কোলাঘাট
ডেবরা
খড়্গপুর
শ্যামপুর
বারুইপুর
বেলিয়াবেড়া
তমলুক
সবং
ডায়মন্ড হারবার
জয়নগর
বেলদা
ভগবানপুর
সুতাহাটা
হলদিয়া
নয়াগ্রাম
মোহনপুর
এগরা
কাকদ্বীপ
কাঁথি
দিঘা
নিউমুর দ্বীপ
২৫ ০ ২৫ ৫০ ৭৫ কিমি

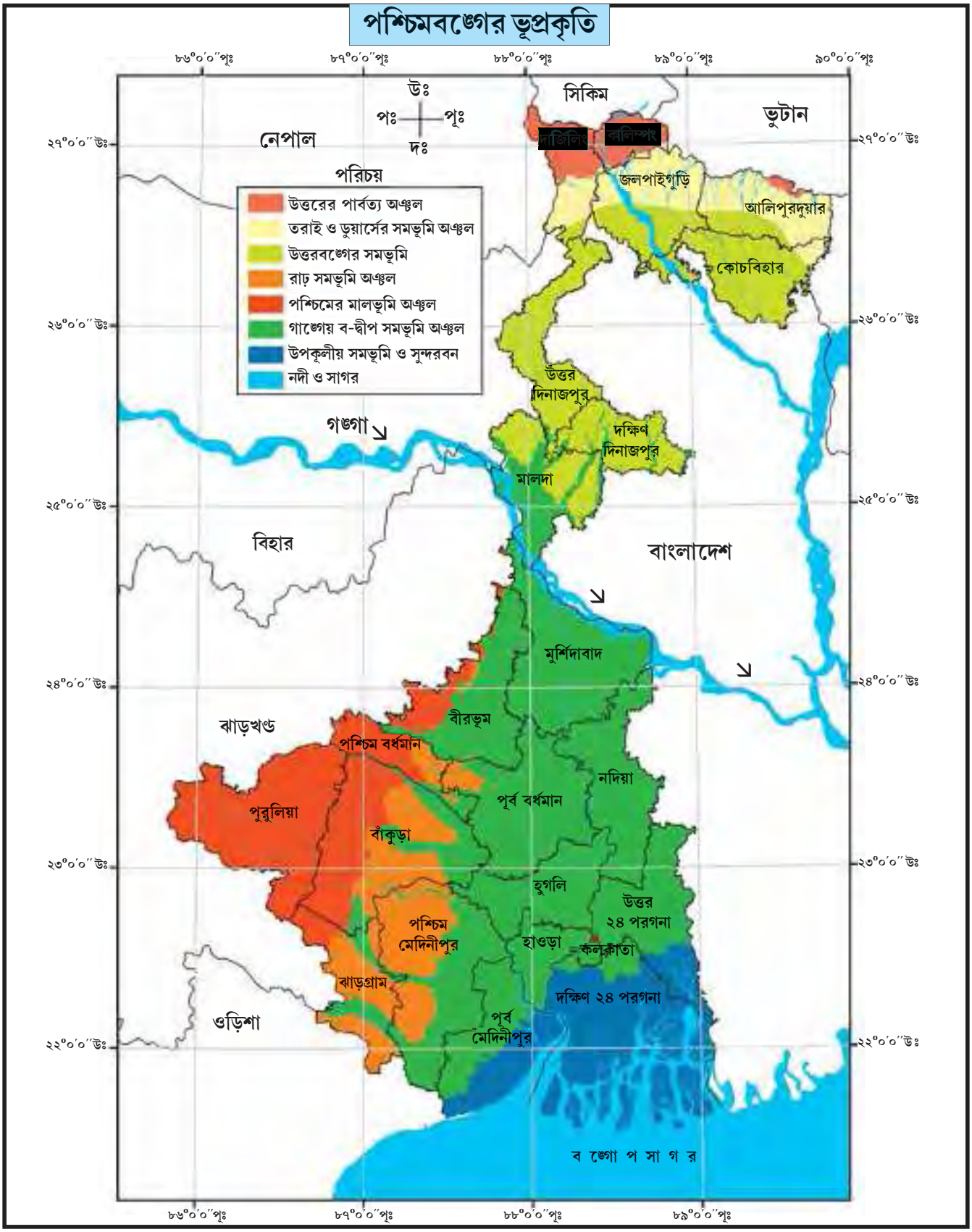
পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি
৮৬°০′০″পূঃ
৮৭°০′০″পূঃ
৮৮°০′০″পূঃ
৮৯°০′০″পূঃ
৯০°০′০″পূঃ
২৭°০′০″উঃ
২৬°০′০″উঃ
২৫°০′০″উঃ
২৪°০′০″উঃ
২৩°০′০″উঃ
২২°০′০″উঃ
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
সিকিম
ভুটান
নেপাল
দার্জিলিং
কালিম্পং
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
পরিচয়
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
তরাই ও ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চল
উত্তরবঙ্গের সমভূমি
রাঢ় সমভূমি অঞ্চল
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল
গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সমভূমি অঞ্চল
উপকূলীয় সমভূমি ও সুন্দরবন
নদী ও সাগর
উত্তর দিনাজপুর
দক্ষিণ দিনাজপুর
মালদা
গঙ্গা
বিহার
বাংলাদেশ
মুর্শিদাবাদ
ঝাড়খণ্ড
বীরভূম
পশ্চিম বর্ধমান
নদিয়া
পূর্ব বর্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলি
উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিম মেদিনীপুর
হাওড়া
কলকাতা
ঝাড়গ্রাম
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ওড়িশা
পূর্ব মেদিনীপুর
ব ঙ্গো প সা গ র

তরাই অঞ্চল

এই নিত্যবহ নদীগুলির বয়ে আনা নুড়ি, বালি আর পলি নিয়ে পর্বতের পাদদেশে যে প্রায় সমতলভূমির সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলে **তরাই**। এখানকার মাটি স্যাঁতস্যাঁতে। এই অঞ্চল দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার দক্ষিণ অংশ; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের উত্তর অংশ এবং কোচবিহারের সামান্য অংশ নিয়ে গঠিত।

উত্তরের সমভূমি

তরাই অঞ্চলের দক্ষিণ দিক থেকে গঙ্গা নদীর বাম তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলো উত্তরের সমভূমি। এই সমভূমি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ অংশ, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর আর মালদা জেলার প্রায় পুরোটা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের মহানন্দা নদীর পূর্বদিকের ভূমি যথেষ্ট শক্ত আর অনুর্বর। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ভূমি যথেষ্ট উর্বর।

উত্তরবঙ্গের নদী

উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের অন্যান্য নদী হলো টাঙ্গন, পুনর্ভবা। এই অঞ্চলে খুব ঘন জঙ্গল চোখে পড়ে না। পিপুল, নিম, তেঁতুল, বাঁশ, বাবলা এইসব গাছ এখানে জন্মায়। এখানকার ভূমিভাগের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০-৫০ মিটার।

দক্ষিণবঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র পৃষ্ঠা 20)।

মালভূমি অঞ্চল

পুরো পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া আর ঝাড়গ্রামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত আমাদের রাজ্যের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল (পৃষ্ঠা 21)। অঞ্চলটির ঢেউ খেলানো ভূমির মাঝে মাঝে উঁচু টিলা আর পাহাড় দেখা যায়। মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা ৫০ থেকে ২০০ মিটার উচ্চতায় রয়েছে।

মালভূমি অঞ্চল

শালের জঙ্গল

কাঁকর, পাথর মেশানো এই অঞ্চলে লালচে রঙের মাটি অনুর্বর। দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা— এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের নদী মানচিত্র লক্ষ করলে দেখবে সবগুলো নদীই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে গেছে। তাহলে আমরা জানলাম পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের ভূমির ঢাল পূর্বমুখী। শাল, মেহগনি, পলাশ, মহুয়া. শিমুল, কেন্দু নানা ধরনের গাছ এখানে দেখা যায়।

দক্ষিণবঙ্গের নদী

রাঢ় অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতির মানচিত্র দেখো (পৃষ্ঠা 21)। পশ্চিমের মালভূমির ঠিক পূর্বে রয়েছে রাঢ় সমভূমি। বাঁকুড়া, বীরভূমের কিছু অংশ, পশ্চিম বর্ধমানের পূর্বদিক, পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম দিক আর প্রায় পুরো ঝাড়গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছে রাঢ় অঞ্চল। এখানকার ভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ৫০-১০০ মিটার।

সেগুন

দামোদর নদী মালভূমি অঞ্চল হয়ে রাঢ় সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে হুগলি নদীতে। হুগলির কাছাকাছি দামোদর থেকে বেরিয়ে মুণ্ডেশ্বরী নদী মিশেছে রূপনারায়ণে। শিলাবতী আর দ্বারকেশ্বর— এই দুটি নদীর মিলিত ধারা হল রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণ মিশেছে হুগলি নদীতে। আর কেলেঘাই ও কংসাবতী নদীর মিলিত ধারার নাম হলদি। এই নদী হলদিয়াতে গিয়ে মিশেছে হুগলি নদীর সঙ্গে। রাঢ় সমভূমির মাটি বেশ উর্বর। এই সমভূমির উত্তর আর পশ্চিম ধার বরাবর লালচে রঙের মাটি দেখা যায়। এখানে শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনি প্রভৃতি নানা ধরনের গাছ জন্মায়।

গাঙ্গেয় সমভূমি

গাঙ্গেয় সমভূমির একটি অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতির মানচিত্রে রাঢ় অঞ্চলের পূর্বদিকে রয়েছে গাঙ্গেয় সমভূমি। তোমরা সবাই গঙ্গা নদীর নাম শুনেছ, আবার কেউ কেউ দেখেছ। গঙ্গা নদীর উৎস ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা। এই নদী উত্তরপ্রদেশ, বিহার হয়ে আমাদের রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলায় ঢুকেছে। এরপর দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একটি শাখা বাংলাদেশের ভিতর চলে গিয়েছে পদ্মা নামে। আরেকটি ধারা পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই ধারার নাম ভাগীরথী আর নবদ্বীপের পর থেকে এর নাম হুগলি। এই ভাগীরথী-হুগলি নদী আরও দক্ষিণে বয়ে গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। গাঙ্গেয় সমভূমির অধিকাংশ নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তাই এই অঞ্চল দক্ষিণ দিকে ঢালু। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-হুগলি নদীকে অনেকে গঙ্গাও বলেন। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আর পূর্ব মেদিনীপুরের কিছুটা অংশ নিয়ে গঠিত এই সমভূমি অঞ্চল। সমুদ্র সমতল থেকে এর গড় উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিটার।

ভাগীরথী-হুগলি ছাড়াও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে জলঙ্গী, চূর্ণি, ইছামতি ও আরও কিছু নদী বয়ে গিয়েছে। এই নদীগুলোর বয়ে আনা পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে এই সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। ফসল চাষের উপযুক্ত।

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে অশ্বত্থ, বট, শাল, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, শিশু প্রভৃতি নানা ধরনের গাছ দেখা যায়। উত্তর ২৪ পরগনার পারমাদন বনভূমিতে (বর্তমান নাম বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য) অনেক খরগোশ, হনুমান, হরিণ, নানা ধরনের পাখি আর কাঠবিড়ালি আছে।

নীচের সারণিতে তোমার অঞ্চলের ভূমিরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

তোমার জেলার নাম	পশ্চিমবঙ্গের যে দিকে অবস্থিত	পশ্চিমবঙ্গের যে ভূপ্রাকৃতিক ভাগের মধ্যে পড়ে	তোমার অঞ্চল বা কাছাকাছি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম	তোমার অঞ্চল বা এলাকার ভূমির ঢাল (কোন দিক থেকে কোন দিকে)	তোমার অঞ্চল সমুদ্রের জলতল থেকে সামান্য উঁচু কিছুটা উঁচু/ বেশ উঁচু

নদীতীরের সভ্যতা

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে আগে অনেক নদী ছিল যারা আজ হারিয়ে গেছে, যেমন— সুতি, যমুনা, নোয়াই। বিদ্যাধরী নদীর ধারের এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে বহু বছর আগেকার ঘর-বাড়ি, বাসনপত্রের অবশিষ্ট পাওয়া গেছে। এই জায়গায় ছিল চন্দ্রকেতু রাজার দূর্গ। বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া কিছু বড়ো বড়ো নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল বহু বছর আগেকার পুরোনো সভ্যতা। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল জনজীবন, তাই এইসব সভ্যতাকেই বলে নদীমাতৃক সভ্যতা।

নীচের সারণিটি পূরণ করো :

দক্ষিণবঙ্গের যে নদীর কাছাকাছি আগেকার দিনের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল তার নাম	অঞ্চলটির ভূমির বৈশিষ্ট্য	অঞ্চলটির দুটি বিলুপ্ত নদীর নাম	অঞ্চলটিতে পুরোনো সভ্যতার কী নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল

সুন্দরবন

আমাদের রাজ্যের দক্ষিণে আছে গভীর জঙ্গল সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অংশ জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। তবে সুন্দরবনের বেশিরভাগটাই আছে বাংলাদেশে। এই অঞ্চলের ভূমির উচ্চতা গড়ে ৩ মিটার আর ভূমির ঢাল খুবই কম। পুরো অঞ্চল অসংখ্য নদীতে ভরা। মাতলা, বিদ্যাধরী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল, পিয়ালী এখানকার নদী। জোয়ারের সময় নদীগুলিতে সাগরের জল চলে আসে, তাই নদীর জলে নুনের ভাগ বেশি।

সুন্দরবনের মাটির চরিত্র একটু অন্যরকম। সাগরের খুব কাছে থাকায় মাটির নীচের জলের স্তরের সঙ্গে সাগরের যোগ রয়েছে। তাই এখানকার মাটি লবণাক্ত। মাটিতে কাদার ভাগ বেশি আর বালির পরিমাণ কম। সুন্দরবন অঞ্চলে ভূমির ঢাল যথেষ্ট কম, তাই সহজেই ভাগীরথী-হুগলি, পদ্মা ও অন্যান্য নদীর পলি জমা হয়েছে এখানে। ধীরে ধীরে এই পলি জমে তৈরি হয় দ্বীপ ও তার পাশে ঘন বন। যে ধরনের গাছ নিয়ে এই বন তৈরি হয়েছে তাকে বলে ম্যানগ্রোভ। সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া, বাইন হলো ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। সুন্দরবনের নুনযুক্ত কাদামাটিতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জন্মায়। এদের দুরকম মূল থাকে। মাটির গভীরে গাছের শিকড় আটকে রাখার মূল হলো ঠেসমূল। আরেক রকম মূল মাটি থেকে উপরের দিকে উঠে আসে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য, একে বলে শ্বাসমূল।

জেনে রাখো

যে ভূভাগের চারিদিক জল দিয়ে ঘেরা তাকে বলে দ্বীপ।

মানচিত্রে দেখো, সুন্দরবন অঞ্চলে রয়েছে অনেক দ্বীপ। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ১৩৫টি দ্বীপের মধ্যে প্রায় ৩৫টি দ্বীপ মানুষ জঙ্গল কেটে তৈরি করেছে বসতি।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

তোমরা সবাই 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর নাম শুনেছ। এই বিখ্যাত প্রাণীর বাসভূমি হলো সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল। এছাড়াও এখানকার খাঁড়িতে আছে কুমির, ডাঙায় আছে মেছোবিড়াল, বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ। এখানে একশো বছর আগেও চিতা বাঘ, জাভান গন্ডার, বুনো মহিষ, বারাশিঙ্গা দেখা যেত।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি নদী মানচিত্র ভালোভাবে লক্ষ করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

নদীর নাম	কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে	পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত	কোন নদীতে বা সাগর গিয়ে মিশেছে	নদীর প্রকৃতি
তোর্সা				
দ্বারকেশ্বর				
কেলেঘাই				
চূর্ণি				
সুবর্ণরেখা				

মনে রাখা জরুরি:

- নিত্যবহ নদী — যেসব নদীতে প্রায় সারাবছর জল থাকে।
- পর্বতশৃঙ্গ — পর্বতের সবচেয়ে উঁচু অংশ বা চূড়া।
- তরাই — পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলের স্যাঁতস্যাঁতে নীচু ভূমি।

তোমরা এই বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণির 'পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

সমুদ্রের জলতল থেকে ভূমির উচ্চতা মাপলে গাঙ্গেয় সমভূমির থেকে নীচু জায়গা হলো — ক) রাঢ় অঞ্চল খ) মালভূমি অঞ্চল গ) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ঘ) সুন্দরবন।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

উত্তরাখণ্ডের _____ গুহা থেকে গঙ্গার শুরু।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ গঙ্গার বদ্বীপের মাটি অনুর্বর।

৩.২ চূর্ণি একটি নিত্যবহ নদী।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ভূমির ঢাল কোনদিক থেকে কোন দিকে?

৪.২ গঙ্গা নদীর যে ধারাটি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার নাম কী?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

দক্ষিণবঙ্গের ভূমির বৈশিষ্ট্য কী?

4

পরিবেশ ও সম্পদ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- প্রকৃতি ও মানুষ মিলে কিভাবে সম্পদ তৈরি করেছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম ও কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- দিবস পালন কেন করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
- যারা দেশের ও দশের জন্য কাজ করেছেন তাদের কেন আমরা মনে রাখব, তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রকৃতি ও মানুষ মিলে তৈরি করে সম্পদ

মানুষের স্বাস্থ্য একটা সম্পদ। তা আছে বলেই পরিশ্রম করতে পারে। বুদ্ধি আর একটা সম্পদ। আর প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে আরও অনেক সম্পদ। সে সব নিয়ে, নিজের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে, আরও অনেক সম্পদ তৈরিও করছে মানুষ।

মাটি আর কয়লা দিয়ে তৈরি করেছে ইট। তা দিয়ে করেছে পাকা বাড়ি। প্রথমে মানুষ সব কিছু কাঁচা খেত। তারপর যখন আগুন জ্বালাতে শিখল তখন মাংস ঝলসে খেত। তারপর তৈরি করল মাটির বাসনপত্র।

এভাবে মানুষ নিজের প্রয়োজনে একের পর এক জিনিস তৈরি করেছে। একজন বুদ্ধি করে কিছু করত আর একজন তা শিখত। তারপর বুদ্ধি করে আর একটু ভালো কিছু করার চেষ্টা করত। বুদ্ধিই মানুষের বড়ো সম্পদ। এভাবে যোগ না হলে একার বুদ্ধিতে বেশি দূর এগোনো যায় না।

স্মরণীয় যাঁরা

ভালো ভালো কাজ করে অনেকেই খুব বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের আমরা চিরদিন মনে রাখি। তাঁদের আমরা সম্মান করি। তাঁদের জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানাই। যেমন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ওঁরা নানারকম লেখা লিখেছেন। দেশের মানুষের ভালোর কথা ভেবেছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজি নজরুল ইসলাম

দেশের মানুষের ভালো আরও অনেকেই করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া মানুষের জন্য কাজ করেছেন।

রাজা রামমোহন রায়

বিদ্যাসাগর

ডিরোজিও

আগেকার দিনের মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল। বাড়িতে মেয়ে জন্মালে অনেকে দুঃখ পেত। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখতে দিত না। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত। কখনও কখনও বর মারা গেলে বউকেও তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারত। এসব অন্যায় দেখে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশের মানুষকে হাতেকলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তিনি বলতেন ফুটবল খেলো, তাতে শরীর-মন ভালো হবে। শুধু বই পড়ে কিছু হয় না। ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনের পরোয়া না করে প্লেগ রোগীদের সেবা করেছেন। বেগম রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা

বেগম রোকেয়া

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন বিরাট বিজ্ঞানী। আবার খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন ওঁরা। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদেরও আমরা শ্রদ্ধা করি।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

মেঘনাদ সাহা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গান্ধিজি ও নেতাজি—দুজনেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক কষ্ট করেছিলেন। গান্ধিজি সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন ইংরেজদের বিরোধিতা করার জন্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

অনেকদিন ধরে লড়াই করেই দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে। অনেক লোক সেই লড়াইতে ছিল। তাদের সবার নাম আমরা জানি না। তবে কেউ কেউ খুবই বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের কাজের জন্য। যেমন—ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষুদিরাম বসু

সূর্য সেন (মাস্টারদা)

ভগৎ সিং

দেশের জন্য লড়াইতে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরাও লড়াই করেছিলেন। যেমন—মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

মাতঙ্গিনী হাজরা

কল্পনা দত্ত

দিবস পালন

মনীষীদের জন্মদিনের পাশাপাশি আরও নানারকম দিবস পালন করা হয়। সাধারণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, পরিবেশ দিবস, অরণ্য সপ্তাহ।

- উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীরা বাঁচবে না। একথা বারবার মনে করানো দরকার। তাই অরণ্য সপ্তাহ পালন। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস।
- ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। তাই ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করবই।
- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ খুব বড়ো মাপের পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন উনি। ওঁর জন্মদিনে শিক্ষক দিবস পালিত হয়।

- জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। শিশুদের উনি খুব ভালোবাসতেন। তাই তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালন করি।
- স্বাধীন ভারত দেশটা কেমন করে আমরা চালাব তার জন্য নিয়ম চালু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই তারিখটাই ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র দিবস।

কেউ যেন না হারিয়ে যায়

বনভূমিতে বসবাসের অধিকার নিয়ে ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বিরসা মুণ্ডা, সিধো, কানহু ও অনেকে। তির-ধনুক নিয়ে হাজার হাজার মানুষ মোকাবিলা করেছিল ইংরেজ সেনার।

তিতুমির ও তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গী জমিদারদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিতুমির তৈরি করেছিলেন বাঁশের কেল্লা।

বিরসা মুণ্ডা

তিতুমির

সিধো

এঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ। এঁদের যেন আমরা কখনও না ভুলি।

মনে রাখা জরুরি :

- স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি মানুষের বড়ো সম্পদ।
- স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ একের পর এক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করেছে।
- ভালো ভালো কাজ করেছেন যাঁরা তাঁদের আমরা চিরদিন মনে রাখব।
- গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা সেই দিনগুলি পালন করি।

তোমরা এই বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণির 'পরিবেশ ও সম্পদ' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করো :

১.১ বনভূমিতে বসবাসের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলেন_____।

১.২ দেশের মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন _____।

১.৩ ২৬ জানুয়ারি _____ দিবস পালিত হয় ।

১.৪ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন _____ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

২.১ জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২.২ আমরা ১৫ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করি।

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ ভগিনী নিবেদিতাকে কেন আমরা শ্রদ্ধা করি?

৩.২ বেগম রোকেয়া কেন স্মরণীয়?

5

পরিবেশ ও উৎপাদন

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- মাছেদের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করতে পারবে।
- মাছ ধরার সরঞ্জামের নাম উল্লেখ ও বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় মাছের নাম উল্লেখ করতে পারবে।
- বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় মাছের সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতির কথা তোমরা আগেই জেনেছ। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের মাটি দেখা যায়। আবার সারা রাজ্য জুড়ে বৃষ্টিপাতের তারতম্য লক্ষ করা যায়। তাই ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ুর বিভিন্নতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকাজে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি

পার্বত্য অঞ্চলের চাষাবাদ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নীচে নেমে আসে। তাই এখানে পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে চাষ করা হয়। একে বলে **ধাপচাষ**। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল চা। এছাড়া গম, ভুট্টা, আদা, সয়াবিন, স্কোয়াশের চাষ হয়। সারা বছর ঠান্ডা আবহাওয়ার জন্য শীতের সব্জি— বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং, মূলোর ফলন এখানে ভালোই হয়। দার্জিলিং বেড়াতে এলে তোমরা অনেক কমলালেবুর বাগান দেখতে পাবে।

স্কোয়াশ

ধাপচাষ

চা বাগান

কমলালেবুর বাগান

তরাই আর মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টির জল তিস্তা আর মহানন্দা নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তরাই অঞ্চলে। এই নদীগুলোর বয়ে আনা পলি জমে এখানকার মাটি উর্বর হয়েছে। এই উর্বর পলিমাটিতে ধান, পাট, গম ও নানারকম শাকসবজির চাষ হয়। এছাড়া পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল হওয়ায় তরাইয়ের জমি ঢালু আর এখানে মাঝারি বৃষ্টি হয়, গরম পড়ে না। তাই এখানেও চা চাষ হয়। এই

অঞ্চল আনারস, কলার জন্য বিখ্যাত। মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে ধান, পাট, আখ, নানা ধরনের সব্জি, আম, লিচুর চাষ হয়। মালদার ফজলি আম বিখ্যাত। এছাড়া এই অঞ্চলে রেশম কীট পালনের জন্য তুঁত গাছের চাষ করা হয়।

আনারস

আম

তুঁত গাছে রেশম কীট পালন

গাঙ্গেয় বদ্বীপ আর রাঢ় অঞ্চলের কৃষি

এবার আমরা জানব রাঢ় অঞ্চল আর গাঙ্গেয় সমভূমির কৃষি সম্বন্ধে। পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি আলোচনার সময় তোমরা জেনেছ যে ভাগীরথী-হুগলি নদীর পশ্চিমদিক আর পূর্বদিকের ভূমি সমতল। এই দুদিকের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় সমান। তাই দুই অঞ্চলেই প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। বর্ধমানের মাটিতে ধানের ফলন খুব বেশি।

ধান চাষ

আলু চাষ

শীতকালে এই অঞ্চলে বেশি পরিমাণে আলুর চাষ করা হয়। তোমরা জানো, আলু হলো গাছের কাণ্ড, তাই আলু হয় মাটির নীচে। এই গাছগুলির উচ্চতাও খুব বেশি হয় না। আলু খেতের পাশে সরষেরও চাষ করা হয়।

মুণ্ডেশ্বরী আর দামোদরের দুপাশে ঝিঙে, পটল, বেগুন, ঢেঁড়শের পাশাপাশি নানারকম ফুলেরও চাষ করা হয়। সাধারণত শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে ফুলের চাষ হয়। কারণ কী জানো? ফুল সহজে পচে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এমন জায়গায় ফুলের চাষ করা হয় যাতে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি তা বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা যায়। এছাড়া এখানে সরষে ও তিলের চাষ করা হয়। গাঙ্গেয় সমভূমির বিভিন্ন জায়গায় পান, ফুটি, তরমুজের চাষ হয়। এই সমভূমির দক্ষিণ দিকে নারকেল, সুপারির ফলন ভালো হয়।

ফুলের চাষ

পশ্চিমের পাহাড়ি লালমাটির কৃষি

মালভূমির কাঁকুরে, লালচে মাটি কৃষির জন্য খুব উর্বর নয়। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। অঞ্চলটি পশ্চিম থেকে পূর্বে ঢালু হওয়ায় এখানে জল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে চলে যায়। তাই কম জলের ফসল যেমন— মটর, অড়হর, মসুর, বিউলি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ডাল, ভুট্টার মতো দানাশস্য, বাদাম চাষ করা হয়।

ডালের চাষ

এখানে ধানের ফলন কম। তাই মানুষ উঁচু জায়গার মাটি কেটে ছোটো চাষের জমি তৈরি করছে। তার চারপাশে আল দিয়ে বর্ষার জল আটকে সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করছে। তবে এখানে ভূমির ঢাল পার্বত্য অঞ্চলের তুলনায় কম হওয়ায় চাষের জমিগুলো ছোটো হয়।

দক্ষিণের নোনাজলের কৃষি

নারকেল গাছ

তোমরা জানো, দক্ষিণের অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের খুব কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার মাটি লবণাক্ত অর্থাৎ মাটিতে নুনের পরিমাণ খুব বেশি। তাই এখানকার মাটিতে সবরকম ফসলের চাষ হয় না। এখানে নারকেল হয়, দীঘার কাছে কাজুবাদামের চাষ হয়। এছাড়া তরমুজ, পান, লঙ্কা, সূর্যমুখী, ভুট্টা, খেসারি এই সবেরও চাষ হয়।

নীচে পশ্চিমবঙ্গের যেসব অঞ্চলের কথা বলা হলো সেখানকার প্রধান ফসল কী তা সারণিতে লেখো।

অঞ্চল	কী কী প্রধান ফসল
দার্জিলিং জেলা	
তরাই অঞ্চল	
গাঙ্গেয় বদ্বীপ	

কৃষিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার

খেতের ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য দরকার হয় সার আর কীটনাশক। আগেকার দিনের মানুষরা গোবরকে সার হিসেবে ব্যবহার করতো। আবার কোথাও কোথাও ফসলের পোকা মারার জন্য কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার হতো নিমপাতা।

পরে চাষের কাজে বেশি ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক সার আর রাসায়নিক কীটনাশক। তবে মনে রেখো জমিতে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা কমে যায়, ফসলের ফলনও ভালো হয় না। আবার রাসায়নিক কীটনাশকের বেশি ব্যবহারেও জমির ক্ষতি হয়। এই কীটনাশক মাটির নীচের জলে মিশে জলকে দূষিত করে তোলে। তখন ওই জল আর ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। অনেক জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল থেকে জল তোলা বন্ধ করে দিতে হয়।

চাষের কাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার

চাষের কাজে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার

তাই নতুন ভাবনা এল। এখন ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে জৈব সার, অণুজীব সার, জৈব কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে। ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্যে নানা ধরনের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অনেক জায়গায় বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখে পরে চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে ফসল উৎপাদন করলে জমি উর্বর থাকবে আর অনেকদিন ধরে সেই জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

মাছ চাষ

জমিতে চাষ করার পাশাপাশি অনেক মানুষ মাছ চাষও করেন। সাগরের কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁরা সমুদ্রেও মাছ ধরেন। সমুদ্র থেকে সার্ডিন, ইলিশ, নানারকম চাঁদা, ভোলা, লোটে - এইসব মাছ ধরা হয়। আবার অনেকে ভেড়িতেও মাছ চাষ করেন। পারসে, ট্যাংরা, ভেটকি, পাবদা, রুই, মৃগেল, কাতলা—এইসব মাছের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এগুলো ভেড়ি , পুকুর, খাল, বিল সব জায়গায় চাষ করা হয়। এছাড়া বাগদা, গলদা, নানারকম চিংড়ির চাষও করা হয়।

জেনে রাখো

মাছের ভেড়ি : চারিদিক থেকে জলকে আটকে রেখে যেখানে মাছের চাষ হয়।

কাতলা মাছ

সার্ডিন

লোটে মাছ

নীচের মাছগুলোর কোনটা সামুদ্রিক আর কোনটা ভেড়িতে চাষ করা হয় লেখো।

মাছ	সামুদ্রিক না ভেড়ির মাছ	মাছ	সামুদ্রিক না ভেড়ির মাছ
১) পারশে		৫) ইলিশ	
২) সার্ডিন		৬) ভেটকি	
৩) ট্যাংরা		৭) লোটে	
৪) পমফ্রেট		৮) রুই	

হরেকরকম মাছ

পুকুর, নদী, খাল, বিল, নালা-নর্দমা এমনকি জল-জমা ধানের খেতেও মাছ হয়। অনেকসময় খুব বৃষ্টি হলে আশেপাশের জায়গা থেকে পুকুরে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করে। তখন স্রোতের উল্টোদিকে মাছেরা সাঁতরে চলে যায়। এইভাবে মৌরলা, পুঁটি, রুই, মৃগেল, কই, শিঙি, মাগুর, খলসে, ফলুই—সব মাছে ধানখেত ভরে ওঠে। তবে এদের মধ্যে বেশিদিন বেঁচে থাকে শিঙি, মাগুর, শোল ইত্যাদি। মাছের মধ্যেও রকমভেদ আছে। কোনো মাছের কাঁটা বেশি, কোনোটার গন্ধ অন্যরকম, কোনোটা আবার খুব নরম।

মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম

নৌকো করে, ট্রলারের সাহায্যে অনেকে সমুদ্রের সার্ডিন, লোটে, ইলিশ-এইসব মাছ ধরতে যান। এছাড়া মাছ ধরার নানারকমের জাল আছে। যেমন—ফাঁদি জাল, পুরো পুকুর ঘিরে ফেলার জাল ইত্যাদি। একই জাল বিভিন্ন জায়গায় নানা নামে পরিচিত। বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি বাক্স স্রোতের মুখে পেতে মাছ ধরা হয়। এর ভেতরে মাছ ঢুকতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না। একে বলে **ঘুনি**। পাশের ছবি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে মাছের চারপাশ ঘিরে তারপর হাত ঢুকিয়েও মাছ ধরা যায়। এছাড়া ছিপ দিয়েও অনেকে মাছ ধরেন।

নানারকমের মাছ ধরার জাল

লুপ্তপ্রায় মাছ

ন্যাদোশ

যে সব মাছ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে তাদের বলে লুপ্তপ্রায় মাছ। যেমন—ন্যাদোশ, খলসে, সরপুঁটি, খরশুলা লুপ্তপ্রায় মাছের উদাহরণ। এইসব মাছের প্রজাতি সংখ্যায় খুব কমে গেছে।

যেগুলো লুপ্তপ্রায় মাছ সেগুলো ✓ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করো। যেগুলো লুপ্তপ্রায় নয় সেগুলোর নামের পাশে × চিহ্ন দাও।

মাছ	লুপ্তপ্রায় / লুপ্তপ্রায় নয়
১. ন্যাদোশ	
২. কাতলা	
৩. খলসে	
৪. রুই	
৫. খরশুলা	

মাছ সংরক্ষণ

তোমরা জানলে লুপ্তপ্রায় মাছের কথা। এবার জেনে নাও এদের সংরক্ষণের উপায় —

- ♦ লুপ্তপ্রায় মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।
- ♦ লুপ্তপ্রায় মাছ ধরার জায়গায় পঞ্চায়েত প্রধানের সাহায্যে নিষেধাজ্ঞা বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- ♦ বাচ্চা মাছ হাটে-বাজারে কেনাবেচা করলে জরিমানা দিতে হবে।

মনে রেখো জলের পরিবেশ ঠিক রাখতে সব মাছকেই বাঁচানো দরকার। নইলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়বে।

মনে রাখা জরুরি :

- পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে যে চাষ করা হয় তাকে ধাপ চাষ বলে।
- জালের সুতো দিয়ে তৈরি করা একটি খোপ যার সাহায্যে মাছ ধরা হয় তাকে ফাঁদি বলে।
- যে সব মাছ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে তাদের বলে লুপ্তপ্রায় মাছ।

তোমরা এই বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণির 'পরিবেশ ও উৎপাদন' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

পশ্চিমবঙ্গের মালদায় যে ফলের চাষ খুব বেশি হয় তা হলো _____।

২. **ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :**

ধান চাষের জন্য বেলেমাটি প্রয়োজন।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

দার্জিলিং-এর উঁচু ও ঢালু জমিতে কীসের বাগান গড়ে উঠেছে?

৪. **একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ বেশি কীটনাশক ব্যবহার করলে কী ক্ষতি হবে?

৪.২ সমুদ্রের খুব কাছের মাটিতে চাষ ভালো হয় না কেন?

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১.১ জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটি পালিত হয়— (ক) শিক্ষক দিবস (খ) শিশু দিবস (গ) স্বাধীনতা দিবস (ঘ) সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে।

১.২ উত্তরবঙ্গের নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে — ক) পূর্ব থেকে পশ্চিমে খ) উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে গ) পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘ) দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

২. শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ গান্ধিজি ইংরেজদের বিরোধিতা করার জন্য _____।

২.২ আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিলেন _____।

২.৩ বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন _____।

২.৪ একটি বিলুপ্ত নদীর উদাহরণ হলো _____ ।

২.৫ পশ্চিমবঙ্গে কমলালেবুর চাষ হয় _____।

৩. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও :

৩.১ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৩.২ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু।

৩.৩ সুন্দরবন অঞ্চল পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল থেকে উঁচু।

৩.৪ পর্বতের পাদদেশে ঢালু জমিতে জল ভালোভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ আমরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করি কেন?

৪.২ উত্তরবঙ্গের কোথায় একশৃঙ্গ গন্ডার দেখা যায়?

৪.৩ পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে রেশম কীট পালনের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়?

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ দেশের জন্য লড়াইতে এগিয়ে আসা কয়েকজন নারীর নাম লেখো।

৫.২ তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?

৫.৩ তিনটি লুপ্তপ্রায় মাছের নাম লেখো।

৬. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম লেখো।

৬.২ আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এমন কয়েকজন বিপ্লবীর নাম লেখো।

৬.৩ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৬.৪ লুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় সম্বন্ধে লেখো।

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬